তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্রেণি বিচার ও বিশ্লেষণ

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্রেণি বিচার ও বিশ্লেষণ

।। এক।।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার বহুমুখী বিকাশের মধ্যে তাঁর গান স্বভাবতই স্বতন্ত্র ও একক। 'আমি বিশ্বের কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি'– একথা তিনি সগর্বে ঘোষণা করলেও বাংলার মাটিতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বাংলার শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহার ও ধর্ম-উপাসনাকে ভিত্তি করেই তিনি তাঁর লোকোত্তর কবি জীবনকে সর্বসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীন্দ্রপূর্ব বাংলার সাধারণ সমাজ, রাষ্ট্র জীবন, সাহিত্যচর্চা, নাটক, কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্প, ধর্ম ও এমনকি অধ্যাত্ম ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের জীবনকে যে প্রভাবিত করেছিল একথা স্বীকার্য, কিন্তু তিনি সকল কিছুকে গ্রহণ করেও তাদের নূতন রূপে, রসে ও ভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন আর এজন্যেই তিনি আজ পর্যন্ত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরকার।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি এবং তাঁর ধর্ম ছিল 'কবির ধর্ম'। তাঁর ধর্ম সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যান ও উপাসনাকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল। পরমসুন্দরের তিনি উপাসক, তাই তাঁর গান বা সঙ্গীত শুধুই কাব্যধর্মী ছিল না, ছিল সুরধর্মীও। কাব্য ও সুরের একত্র মিলনের বুকে স্বত প্রবাহিত ছিল তাঁর গান, কাব্য সুর ও অধ্যাত্ম ভাবধারা। তাই তাঁর গানে পাই আমরা কাব্য, সুর-অধ্যাত্মভাবের নিবিড় সম্পর্ক। তাঁর গানে এই তিনের সৌন্দর্য মানুষের মনকে করেছে পাগল, অসংখ্য বেদনা ও বন্ধনের মাঝে তাই তাঁর গানে আনে সুশীতল শান্তি বারির অবিরল ঝর্ণা ধারা।

তিনি গান রচনা করেছিলেন সাধকের মন ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। গান রচনার সময় ভাবের

নিবিড়তায় এমনকি নিজেকে তিনি হারিয়ে ফেলতেন, পৃথিবীর সীমার মাঝে থেকেও তিনি অসীমের রাজ্যে করতেন বিচরণ, তাই তাঁর গান সকল মানুষকে তো বটেই, তাঁকে নিজেকেও নিয়ে যেতো দেহ-মনের পারে 'দেহ-মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে"। তাঁর গানে তাই মাখানো আছে আপন ভোলানো ভাব এবং সেই ভাবেই নিয়ে যায় সকল মানুষকে 'সকল সীমার পারে'।

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে অহরহ যে অনাহত অপার্থিব সুর, তারই পেয়েছিলেন তিনি সন্ধান। তারই অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে তিনি দেখেছিলেন বিশ্ব সঙ্গীতের ধারা ও মহিমা এবং নিজের অন্তরেও উৎসারিত করেছিলেন তার উচ্ছল প্রবাহ। তিনি বলেছেন ঃ

> ''সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পণ চলেছে, গান শুনে সেটারই বেদনাবেগ যেন আমার চিত্তে অনুভব করি।"[১]

গান রচনাকালে তিনি নিজেই সর্বদা অন্তরের মাঝে পেতেন এই অনুভব, তাই তাঁর গানের ভেতর পাই আমরা বিশাল বিশ্বসঙ্গীতের সন্ধান, পাই আনন্দময় ও বিশ্বাতীত অপার্থিব অনুভূতি। মোটকথা তাঁর সঙ্গীত কাব্য ও সুরের মাধ্যমে ভারতীয় অধ্যাত্ম ভাব রহস্যের করেছে উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা– কেবলই কথা ও সুরের মেল বন্ধনই নয়।

কবির দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মর্মস্থলে তাই পেয়েছিলেন অনির্বচনীয় এক সত্য বা সত্তার অনুভূতি। ''দি রিলিজিয়ন অব ম্যান"– গ্রন্থের 'দি আর্টিস্ট' নিবন্ধে সঙ্গীত সম্পর্কে তাই স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন–

> "In music, the feelings, distilled in sounds, becomes it self on independent object. It assumes a tune form which is definite but a meaning which is indefinable, and get which grips our mind with a sense of absolute truth."[২]

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর গানের যোগ্য পরিবেশ পেয়েছিলেন কলকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একথা কারোর অজানা নয়। তাঁর মনে সুরের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন অনেক উস্তাদ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পী বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও যদু ভট্ট প্রমুখ কিংবদন্তী শিল্পীর গানই তাঁকে সংগীত সৃষ্টির সূচনা লগ্নে আন্দোলিত করেছিল। কেননা তাঁর গান রচনার প্রথম যুগে রচিত ধ্রুবপদরীতির গানগুলিই এহেন ভাবনার সাক্ষ্য দান করে। তাছাড়া অফুরন্ত সহায়তা পেয়েছেন সঙ্গীতসেবী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকেও।

তখনকার সমাজে প্রচলিত বাংলা টপ্পা, টপখেয়াল, পদাবলী কীর্তন, রামপ্রসাদী, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গীতরীতিও জুগিয়েছিল তাঁকে যথেষ্ট প্রেরণার উপাদান। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ'– এর হল প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গীত সমাজও রবীন্দ্রনাথকে জুগিয়েছিল সঙ্গীত অনুশীলনের প্রেরণা। এই সমাজ সৃষ্টি হল যেন অভিজাত ও সাধারণ সঙ্গীত শিল্পীদের মিলনভূমিরূপে।

তাছাড়া হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গীত শ্রেণির অনুশীলন হতো একমাত্র সৌখীন জমিদার ও ধনী লোকদের বৈঠকখানায়, 'সঙ্গীত-সমাজ' সেই রীতির মধ্যে আনলো এক পরিবর্তন। ফলে এই সমাজের ক্লাসিক্যাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুশীলনের যেমন ব্যবস্থা ছিল, তেমনি ছিল বাংলার অন্যান্য সঙ্গীত-কীর্তন, বাউল, বাংলা-টপ্পা, টপখেয়াল প্রভৃতি। ফলে সর্বসাধারণ পেলো সকল শ্রেণির গান শোনার ও অনুশীলন করার সুযোগ সুবিধা এছাড়া থিয়েটার-অভিনয় প্রভৃতি অনুশীলনের অবাধ প্রচলন এবং প্রেরণাও জোগালো এই সঙ্গীত-সমাজ। রবীন্দ্রনাথ সেই সঙ্গীত-সমাজের প্রেরণা লাভ করেই বলতে গেলে সকল শ্রেণির গান রচনার পথে হলেন অগ্রসর এবং নাটক রচনায়ও পেলেন উদ্দীপনা। গান, নৃত্য সম্বলিত গান, নৃত্য প্রভৃতির নূতন নূতন সৃষ্টি চিন্তার পেলেন তিনি সূত্র। তাছাড়া পরবর্তীকালে দেশে-বিদেশে ভ্রমণকালেও তিনি গান শুনেছিলেন ও নৃত্য দেখেছিলেন বিচিত্র রকমের। সেই সকল শোনার ও দেখার অভিজ্ঞতা-সংস্কার তাঁর ভবিষ্যৎ গান রচনার ক্ষেত্রকে করেছিল সমৃদ্ধ। সংকীর্ণতা মুক্ত ছিল তাঁর মন সকল সময়েই, তাই সকল দেশ ও সকল জাতির কাছ থেকে ভাল ও সুন্দর সকল কিছুকেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাঁর নূতন গীতভাণ্ডারকে পূর্ণ করার জন্য। তারই জন্য তাঁর গানের সুরে, নৃত্যের ভঙ্গিতে ও তালের ছন্দে একদিকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এবং অপরদিকে বৃহত্তর ভারতের ও পাশ্চাত্য দেশের ভিন্ন সুর, ভঙ্গি ও ছন্দের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল অপরূপভাবে।

তাঁর গীতি ও নৃত্যছন্দের মধ্যে তাই লক্ষ্য করি আমরা দুটি পরিবেশের বিকাশ ঃ একটি– প্রাকৃতিক ও পূর্ব নির্দিষ্ট এবং অপরটি নিজ-সৃষ্ট ও নিজ-নির্বাচিত। এই দুই পরিবেশের মধ্যে তিনি প্রথমটির প্রভাব ও সাহায্য পেয়েছিলেন শিশুকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। তারপর এলো গান রচনার প্রেরণা এবং জ্যোতিদাদার পিয়ানোর সুরের সাথে সাথে চললো গানের মহড়া ও গানের রচনা। রচনা করলেন তিনি কাব্যসৌন্দর্য দিয়ে কত শত হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ, ধামার প্রভৃতি শৈলীর গান

সৃষ্টির উন্মাদনা ও সৌন্দর্যের আস্বাদন- আকুলতা তখন স্বত উচ্ছ্বসিত। দিগন্ত-বিস্তারি অফুরন্ত আশা ও আনন্দের উচ্ছ্বাস নিয়ে তিনি সৃষ্টি করে চললেন কখনো পুরাতনের বুকে নূতনের এবং কখনো বা সম্পূর্ণ পুরাতন নির্মুক্ত নুতন নুতন গান।

নূতন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এলো তাদের বিচিত্র বিকাশের দিক বা পালা। এক একটি গান রচনা ও তাতে সুর যোজনা করে রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে গানের শতদল ও সহস্রদল কমল রচনা করলেন। তাদের সৌরভ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো সারা বাংলাদেশের বুকে ও ভারতের চতুর্দিকে,– যে'সব দিকে বাঙালিরা বাসা বেঁধেছিলেন ছোটখাট সমাজ গঠন করে। ক্রমে নির্বাচিত গণ্ডী পার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সকল সমাজে সকল জাতির মানুষের কাছে তার গান এবং প্রসার লাভ করলো পাশ্চাত্য দেশগুলিতে।

।। দুই।।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রেণি-নির্ণয়-ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে শিক্ষালাভ করেছেন যাঁরা (তাঁর রচিত সঙ্গীত তারই নির্দেশের অনুবর্তী হয়ে) তাঁদের কাছে বিধিবদ্ধ শ্রেণি-নির্দেশের-প্রশ্ন হয়তো না আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু কালক্রমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুশীলন ও আলোচনা ক্ষেত্র পরিধি যতই ধীরে ধীরে বিস্তৃত ও বিবর্ধিত হতে লাগল, ততই তার শ্রেণি-নির্দেশ বা শ্রেণি-নির্ণয়ের প্রশ্ন দেখা দিল নিয়মানুসারী ও শৃঙ্খলতাসেবী বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অনুশীলকদের মধ্যে। তাছাড়া এই প্রশ্নের সৃষ্টি হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক নয়– অন্ততঃ শিল্পী-সাধারণের সমাজে।

''গীতবিতান'', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র গানের সংগ্রহ। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে সংগ্রহটি প্রকাশিত হয়। ১৩৩৮-এর আশ্বিনে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে'র আকর গ্রন্থ 'গীতবিতান' আত্মপ্রকাশের পূর্বে তেরোটি গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাঁর 'সমুদয়' গান। এই গ্রন্থ-ত্রয়োদশের আদিতমটি প্রকাশিত হয় ১২৯২ সনে কবি-অনুরাগী যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের আগ্রহাতিশয্যে 'রবিচ্ছায়া' নামে আর শেষতমটি প্রকাশিত হয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'গীতিচর্চা' নামে পৌষ ১৩৩২ সনে।

আজকের গীতবিতানের সঙ্গে প্রথম প্রকাশিত সেই গীতবিতানের অনেক তফাত। আর সেই

পরিবর্তন ঘটিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি নতুন সংস্করণের জন্যে প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াও তিনি নিজে একটি 'বিজ্ঞাপন' লিখলেন ঃ

> ''গীত-বিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন-কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন। –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর''[৩]।

গীতবিতানের প্রথম খণ্ডে (ভাদ্র ১৩৪৫) গানগুলিকে পূজা ও স্বদেশ পর্যায় সন্নিবেশিত করলেন; দ্বিতীয় খণ্ড (ভাদ্র ১৩৪৬) প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক– মোট চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হল। কোনো কোনো পর্যায়ের গানগুলিকে বিভিন্ন উপপর্যায়ে সজ্জিত করা হল। ১৩৪৫-এর ২৫শে বৈশাখ নবজাতক গ্রন্থের জন্য লিখলেন ''উদ্‌বোধন'' কবিতা 'প্রথম যুগের উদয়–দিগঙ্গনে', যার শেষ স্তবক বর্জন করে নতুন সংস্করণ গীত-বিতানের 'ভূমিকা' রূপে স্থান দিলেন। রবীন্দ্রনাথকৃত বিষয় বিন্যাসের একটি তালিকা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে–

''রবীন্দ্রনাথ-কৃত বিষয় বিন্যাস''

প্রচল গ্রন্থে ঃ

ভাগ		সংখ্যা/ ক্রমিক সংখ্যা	পৃষ্ঠাঙ্ক
।। প্রথম খণ্ড ।। ১৩৪৫ ।।			
ভূমিকা		১	১
পূজা			
	গান	৩২/১-৩২	৫-১৮
	বন্ধু	৫৯/৩৩-৯১	১৮-৪২
	প্রার্থনা	৩৬/৯২-১২৭	৪২-৫৯
	বিরহ	৪৭/১২৮-৭৪	৫৯-৭৯

সাধনা ও সংকল্প	১৭/১৭৫-৯১	৮০-৮৬
দুঃখ	৪৯/১৯২-২৪০	৮৭-১০৫
আশ্বাস	১২/২৪১-৫২	১০৫-১০
অন্তর্মুখে	৬/২৫৩-৫৮	১১০-১২
আত্মবোধন	৫/২৫৯-৬৩	১১২-১৪
জাগরণ	২৬/২৬৪-৮৯	১১৪-২২
নিঃসংশয়	১০/২৯০-৯৯	১১২-২৬
সাধক	২/৩০০-০১	২২৬-২৭
উৎসব	৭/৩০২-০৮	১২৭-২৯
আনন্দ	২৫/৩০৯-৩৩	১২৯-৩৯
বিশ্ব	৩৯/৩৩৪-৭২	১৩৯-৫৪
বিবিধ	১৪৩/৩৭৩-৫১৫	১৫৫-২০৩
সুন্দর	৩০/৫১৬-৪৫	২০৪-১৪
বাউল	১৩/৫৪৬-৫৮	২১৫-২০
পথ	২৫/৫৫৯-৮৩	২২০-২৯
শেষ	৩৪/৫৮৪-৬১৭	২২৯-৪২
পরিণয়	৯/১-৯	৬০৭-১০

স্বদেশ ৪৬/১-৪৬

।। দ্বিতীয় খণ্ড।। ১৩৪৬।।

প্রেম

গান	২৭/১-২৭	২৭১-৮১
প্রেম বৈচিত্র্য	৩৬৮/২৮-৩৯৫	২৮১-৪২৩

প্রকৃতি

সাধারণ	৯/১-৯	২৭-৩১
গ্রীষ্ম	১৬/১০-২৫	৪৩১-৩৭
বর্ষা	১১৫/২৬-১৪০	৪৩৭-৮১

শরৎ	৩০/১৪১-৭০	৪৮১-৯৩
হেমন্ত	৫/১৭১-৭৫	৪৯৪-৯৫
শীত	১২/১৭৬-৮৭	৪৯৫-৫০০
বসন্ত	৯৬/১৮৮-২৮৩	৫০০-৪০
বিচিত্র	১৩৮/১-১৩৮	৫৪৩-৬০৪
আনুষ্ঠানিক	৯/১০-১৮	৬১০-১৪
পরিশিষ্ট	২	৯০৬-০৭

এরপর ১৩৫৭-এর আশ্বিনে এই গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। এতে প্রথম দুইটি খণ্ডে কবির রচিত যে গান গুলি বাদ পড়েছিল, দুইটি খণ্ড প্রকাশের পরও যে গানগুলি রচনা করেছিলেন এবং অখণ্ডিত আকারে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি এই তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড গীতবিতান থেকে আমরা পাই মোট ৬টি পর্যায়, যেমন– পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ, আনুষ্ঠানিক ও বিচিত্র। এই ৬টি পর্যায়ের মধ্যে থেকে ৩টি পর্যায়ের রয়েছে উপপর্যায়, যেমন–

পূজা পর্যায় আছে ২০ টি উপপর্যায়, প্রেম পর্যায় রয়েছে ২টি উপপর্যায় এবং প্রকৃতি পর্যায় রয়েছে ৭টি উপপর্যায়। যেমন–

পূজা–

গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর বাউল, পথ ও শেষ।

প্রেম–

গান এবং প্রেমবৈচিত্র্য।

প্রকৃতি–

সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত যথাক্রমে।

পূর্বেই আমরা এই তালিকা আরও বিস্তারিতভাবে পেয়েছি এবং শুধুই তাই নয় ওই তালিকায় আমরা পেয়েছি পর্যায় উপপর্যায়ের গানের সংখ্যা। এমন কী গীতবিতানের কত সংখ্যক পৃষ্ঠায় কোন

পর্যায় বা উপপর্যায়ের গান রয়েছে এও জানতে পারি। এই পর্যায় বা উপপর্যায়ের গানের সংখ্যাধিক্য হেতু অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ আসলে ছিলেন 'বর্ষার কবি' অর্থাৎ তাঁর গানে প্রকৃতির ব্যাপক বিস্তৃত পরিসরের কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন।

নিতান্ত শৈশবেই প্রকৃতির সঙ্গে কবির ছিল নিবিড় সম্পর্ক। আত্মপরিচয়েও তিনি এই কথাই বলেছেন,–

''বাল্যকাল থেকে অতি নিবিড় ভাবে আনন্দ পেয়েছি বিশ্ব দৃশ্যে।''[৪]

এই প্রসঙ্গে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন, –

''বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত।''

তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে দেখি প্রকৃতির প্রতিনিয়ত আনাগোনা। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে গানের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সম্বন্ধে কবি 'সংগীত চিন্তায়' বলেছেন,–

''প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না।''[৫]

প্রথম জীবনে পদ্মার তীর থেকে পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পটভূমি কবিকে সে সঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ, মাধবীকুঞ্জ ও শালবীথি ঋতু পরিবর্তনে যে নব নব রূপ পরিগ্রহ করত তা কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না।

বৎসরের প্রারম্ভে কবি বৈশাখকে আহ্বান করেছেন,– 'এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ। তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে। বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।' কিন্তু গ্রীষ্মের 'প্রখর তপন তাপে দারুণ অগ্নিবাণে হৃদয় তৃষায় হানে।' আর 'রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘদগ্ধ দিন। আরাম নাহি যে জানে রে।' কিন্তু এমন রৌদ্রদগ্ধ দিনেও 'আজি সারাদিন ধরে প্রাণে সুর ওঠে ভরে। একেলা কেমন করে বহিব গানের ভার।' তপস্বিণী ধরণী। সারা নীলাকাশে প্রসারিত তার তপের আসনখানি। আর বৃষ্টিবিহীন বৈশাখি দিনে সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।

এই তপের তাপের বাঁধন কাটাবার জন্য কবি আহ্বান করলেন বর্ষাকে,– 'এসো শ্যামল সুন্দর। আনো তব তাপহারা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।' 'শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা।' 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে।' তারপরই আকাশ ভাঙা আকুল ধারা কোথাও, না ধরে। এমন বর্ষার দিনে 'কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী। আজি ভরা বাদরে।' কবি-মন হয়েছে মেঘের সঙ্গী–

''মন মোর মেঘের সঙ্গী
উড়ে চলে দিগদিগন্তের পানে
নিঃসীম শূণ্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে
রিমঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম।"

বর্ষা বিদায় নিল। বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর। এলো শরৎ। শরতের এক টুকরো অপরুপ ছবি,–

''শরৎ, তোমার অরূণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি
শরৎ তোমার শিশির ধোওয়া কুন্তলে
বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি"।

শরতের মোহন রুপ, শিউলি ফুল, শরৎ রবির সোনার আলো, শ্যামল অঙ্গন, সুনীল গগন সবই 'হৃদয়মাঝে হৃদয় দুয়ার, বাহিরে সে ভুবন ভুলায়।'

শরৎ চলে যায়, আসে, হেমন্ত। 'শূন্য এখন ফুলের বাগান, দোয়েল কোকিল গাহে না গান। কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে' হিমের ঘন ঘোমটাখানি দিয়ে হেমন্তলক্ষীর নয়ন ঢাকা। ধরার আঁচল পরিপূর্ণ সোনার ধানে।

অবশেষে কুহেলি বিলীন ভূষণ বিহীন হেমন্তের দিন শেষ হয়ে শীতের হাওয়ার নাচন লাগে। এবার ফসল কাটার পালা। পৌষ দিয়েছে ডাক। আভরণহীন প্রকৃতি। রিক্তপাতা শুষ্ক শাখে। নিষ্করুণ তাপসের কঠিন তপের বাঁধন ভাঙবার জন্য সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রকৃতির এই নিরাভরণ রুপে ব্যথিত কবির জিজ্ঞাস্য,–

''এ কী মায়া, লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে।

আমার সয় না প্রাণে, কিছুতে সয়না যে।

কৃপণ হয়ে হে মহারাজ, বইবে কি আজ

আপন ভুবন মাঝে।”

হিমগিরি ফেলে নিচে যে শীত নেমে এসেছিল তারও দিন ফুরাল। এল বসন্ত ধরাতলে। কবি আবাহন করেছেন বসন্তকে–

‘‘এস এস বসন্ত ধরাতলে।

আন মুহূ মুহূ নব তান, আন নব প্রাণ নব গান।

আন গন্ধ মদভরে অলস সমীরণ।”

বসন্তের আগমণে ‘স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল’। আর ‘রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে। রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে। নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল’। এর পরবর্তী চিত্রকল্পও অতুলনীয়–

‘‘বেণুবন মর্মরে দখিন বাতাসে,

প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে।

মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,

পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,

মাধবী বিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।”

এই ভাবেই রবীন্দ্র সংগীতে ষড় ঋতুর এক অন্তরঙ্গ আলেখ্য আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

।। তিন।।

রবীন্দ্রনাথ ঋতুপ্রেমিক গীতিকবি। বাংলা তথা ভারতের প্রকৃতি যে ঘূর্ণীয়মান ছয়টি ঋতু দ্বারা আবর্ত্তিত, তা দিয়েই কবিমনও সবিশেষ প্রভাবিত। তাই তাদের বন্দনায় তিনি মুখর। প্রত্যেকটি ঋতুই স্ব স্বরূপ বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর গানে ধরা দিয়েছে। এর মধ্যে বর্ষা এবং বসন্ত ঋতুই তাঁর গানে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

বর্ষা ঋতু কবিকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিল এবং এই কারণেই বর্ষা ঋতুর গানে বর্ষাধারার মত পাই নানা বিচিত্র সুরের ঝর্ণাধারা। বর্ষার বর্ণনার মধ্যেও আমরা দেখি তার নানারূপের মনোহরণ

প্রকাশ। তাই কবিমন চিরকাঙ্খিত বর্ষা ঋতুকে আহ্বান জানিয়ে তার আগমনী গান গেয়েছেন–

''এসো শ্যামল সুন্দর

আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।''

গুরু গুরু মেঘ গুমরী গুমরী গরজে গগনে গগনে যখন বর্ষার আগমণ বার্তা জানিয়ে দেয়, তখন কবিও আনন্দ উদ্বেল চিত্তে তাঁর কৃত অমূল্য গীতরাজির নৈবেদ্য নিয়ে স্বাগত জানাতে বসেন সেই 'ক্ষত্রিয় রাজপুতকে' তার পরেই–

''ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে

জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ সে

ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা

শ্যাম গম্ভীর সরসা''।

বর্ষার কত অপরুপ চিত্রই না তিনি এঁকেছেন–

''শালের বন থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে।''

''ওগো, নির্জনে বকুল শাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে, দোদুল দুলিছে।

ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল, আঁচল আকাশ হতেছে আকুল উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক– কবরী খসিয়া খুলিছে।''

''সঘন বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,

মালতী বল্লরী কাঁপায় পল্লব করুণ কল্লোলে–

কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝঙ্কৃত।''

কিন্তু বর্ষার এই আনন্দ মুখরিত দিনেও কবির মন বেদনা বিধুর। দিকে দিকে তিনি শুনেছেন অশ্রুভরা বেদনার সুর।

''কাঁপিছে দেহলতা থর থর,

চোখের জলে আঁখি ভরভর।''

জীবনদেবতাকে এমন দিনে তাঁর মিনতি–

''আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,

ফিরো না তবে ফিরো না, করো করুণ আঁখিপাত।”

আবার–

“বন্ধু রহো রহো সাথে

আজি এ সখন শ্রাবণপাতে।”

বর্ষণ বিধুর আকাশে কবি দেখেছেন তাঁর প্রিয়ার ছায়া–

“আমার প্রিয়ার ছায়া

আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়।”

কখনো বা এই বরিষণ মুখরিত শ্রাবণরাতে একলা বসে গেঁথেছেন তাঁর স্মৃতিবেদনার মালা। ‘ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে’, কবির ভাবনা অনায়াসেই মেঘের সঙ্গী হয়ে উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে, ছুটে আসে মত্ত নদীর হাওয়া, ভেসে আসে কদম, কেতকী, হাসনুহানার গন্ধ নিয়ে বৃষ্টির রিমঝিম ছন্দ। কেমন একটা মায়াময় আবেশে কবির লেখনী চলতে থাকে–

“মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো,

দোলে মন দোলে অকারণ হরষে।”

কিন্তু বর্ষা ঋতুর মধ্যে কেমন একটা নিঃসঙ্গ বেদনার ভাব লুকিয়ে আছে। যা জমাট বাঁধা মেঘ আকাশের নীচে মানব বিরহ ঔদাসীন্য নিয়ে গড়া বর্ষণ মন্দ্রিত নিঃসঙ্গ মুহূর্ত কবিকল্প ভাবপ্রবণ মনকে উড়িয়ে নিয়ে যায় কালিদাসের সেই যুগে।

“বহু যুগের ও পার হতে আষাঢ় এল আমার মনে, কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষণে।। যে মিলনের মালাগুলি ধুলায় মিশে হল ধুলি, গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে।”

বর্ষা মানবজীবনের চির অপরিচিত নিভৃত মনের কোন এক অজানা জগতকে হঠাৎ উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। যা ছিল তার সম্পূর্ণ অজানা অদেখা অথচ তাকেই এতদিন অতি সংগোপনে এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে সবার অজ্ঞাতে সে নিজের মধ্যে একান্তে লালন করে এসেছে। কবির চিন্তায় যা বাহ্যত হারিয়ে যায় তা তো সত্যিই হারায় না। তাই তাঁর চিন্তায় সেদিনের মিলনের যে মালা ধুলায় মিশে ধুলি হয়ে গেছে, তার সুগন্ধ সজল সমীরণে আজও ভেসে আসে তাই তার স্মৃতি হয়ে ওঠে রোমাঞ্চিত এবং সেই সঙ্গে আবিষ্কার করেন নিজের মধ্যেকার কবিকে যে সদা তৃষাতপ্ত বিরহীর ন্যায় প্রিয় সন্দর্শনে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। বৃষ্টিস্নাত কাজলধোয়া অবগুণ্ঠনরতা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে

কবিহৃদয় মাঝে মাঝে সকরুণ উপলব্ধিতে ভরে যায়–

"দূরের পানে মেলে আঁখি,
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।"

চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত কবি আনমনা হয়ে পড়েন।

এইভাবে বর্ষা সঙ্গীতগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বর্ষার সঙ্গে কবির কী নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। কখনো তাঁর হৃদয় ময়ূরের মত নেচে উঠেছে আবার কখন বা বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। এই একই বর্ষা ঋতুর মধ্যে তিনি দেখেছেন প্রকৃতির নানা বিচিত্র সম্ভার। তিনি উদাস চিত্তকে হারিয়ে ফেলেছেন মেঘের মাঝখানে,– বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাত্রে গেঁথেছেন স্মৃতি বেদনার মালা। প্রকৃতি পর্যায়ের সমগ্র গানের প্রায় অর্ধাংশের বেশী বর্ষা ঋতুর গান। এর থেকেই বোঝা যায় যে এই ঋতুটি কবি মানসকে কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র বর্ষা ঋতুর গান রচনা করতেন তাহলেই তাঁর নাম সঙ্গীত জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত।

শৈশব হতেই প্রকৃতির সঙ্গে কবির গড়ে উঠেছিল এক নিবিড় আত্মীয়তা। বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে তিনি দেখেছিলেন অফুরন্ত মাধুর্য, অনুভব করেছিলেন তার প্রাণস্পন্দন। প্রকৃতি তার অপরিসীম বৈচিত্র্য নিয়ে কবির কাছে ধরা দিয়েছে। তাই কবি প্রকৃতির রুপরসগন্ধের বিচিত্র চিত্র এঁকেছেন তাঁর কাব্যে, তার সঙ্গীতে। সঙ্গীতে কবির প্রকৃতি-প্রেমের স্ফুর্তি ঘটেছে বিভিন্ন ঋতুর গানে এবং এখানে যদিও দেখা যায় বর্ষা ঋতুই কবি মনকে প্রভাবিত করেছিল বেশী, কিন্তু অন্যান্য ঋতুর বিচিত্র সম্ভারও কবির দৃষ্টি অতিক্রম করেনি। বর্ষার পরেই বসন্ত ঋতু তার অনিঃশেষ মাধুরী নিয়ে কবির কাছে ধরা দিয়েছে। শীত রিক্ত পৃথিবী বসন্তের আগমণে আবার যেন পুনরুজ্জীবন লাভ করে।

রবি কবি শীত ঋতু সম্বন্ধে যত উদাসীনই থাকুন, সে যখন যাবার বেলায় কবির আর এক প্রিয় ঋতু বসন্তকে উপহার দিয়ে যায় তখন তার প্রতি কবি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারেন না। তাই কবি বসন্তকে সাদর আমন্ত্রণ করেছেন–

"এস' এস' বসন্ত, ধরাতলে।
আন' মুহু মুহু নব তান, আন' নব প্রাণ নব গান।"

বসন্ত ধরিত্রীকে আবার সজ্জিত করবার জন্য এনেছে কত বিচিত্র সম্ভার।

''এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল সাজিখানি হাতে করে।''

বসন্তের উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় কবি মুখর।

''রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে, রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে, নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।''

দখিনা পবন নিখিল হৃদয়ের সঙ্গে কবির হৃদয়েও জাগিয়েছে আনন্দের ঢেউ। কবির ''বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি'', ঋতুরাজ বসন্ত নব যৌবনের দূত সে যে নবীনের পথিকৃৎ, তার রঙ ঘোর লাল। সেই আগুণ ঝরা ছড়িয়ে পড়ে তার পুষ্পসম্ভারের রঙে, রসে, সৌরভে, মৃদু মন্দ দক্ষিণা হাওয়ায়, মিঠে কড়া রোদের ছোঁয়ায়। বসন্তের আগমণে কবি শুনেছেন যৌবনের পদধ্বনি–

''আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি। এই মাধুর্য আছে যৌবনের আমন্ত্রণ।''

''যৌবনেরই ঝড় উঠেছে আকাশ-পাতালে । নাচের তালের ঝঙ্কারে তার আমায় মাতালে।''

প্রকৃতির তখন কী অপরূপ রূপ। ''আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে''– কবি-চক্ষে পলক পড়ে না।

''নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল, বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল''।

বসন্তে মিলন পিয়াসী কবির সকরুণ মিনতি–

''না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।

মিলনপিয়াসী মোরা– কথা রাখো, কথা রাখো।।''

কবি ভাবেন মানুষের সঙ্গে মানুষের আবেগ অনুভূতি আদান-প্রদানের এই তো সুসময়। প্রস্ফুটিত রুপ রঙ, যৌবনপুষ্পের মর্মকোষ নিঃসৃত রস ও গন্ধের প্রতি তার আকর্ষণ আগেও ছিল। বসন্তের দীপ্ত ছোঁয়ায় তা যেন আরো বৃদ্ধি পেলো। মানুষের প্রতি প্রেম-প্রীতির জোয়ার তার হৃদয় নিংড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল আর তাই তিনি ঋতুরাজকে বললেন–

''আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে। ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয় পরো পরো পরো তবে।।''

কিন্তু বসন্ত তো চলে যাবেই, তাই বেদনাবিধুর হয়েছে কবির হৃদয় এবং সে বেদনার সুর ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

''বেদনা কী ভাষায় রে মর্মে মর্মরি গুঞ্জরী বাজে।। সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে, চঞ্চল বেগ বিশ্বে দিল দোলা।।"

এইভাবে বসন্ত ঋতুর গানে আমরা কখনো বা দেখি উল্লাসিত কবির হৃদয়ে জেগেছে সঙ্গীতের গুঞ্জরণ, কখনো বা বসন্তের বিচিত্র সম্ভারে তিনি আত্মহারা, আবার কখনো বা তার বিদায় সম্ভাবনায় কবির হৃদয় হয়েছে ব্যথাতুর।

।। চার।।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার বিচিত্র বিকাশের মধ্যে তাঁর গান সম্পূর্ণতই পৃথক। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ তাঁর গানের সুরে-বাণীতে-ছন্দে অখণ্ড সৌন্দর্যের চরম প্রকাশ। সঙ্গীত হচ্ছে ধ্বনিময় শিল্প। তাই ধ্বনি শিল্প হিসাবে এই সৃষ্টি শ্রোতার মনে যে রসোদ্রেক করে, যে-ভাবের ঐশ্বর্য রচনা করে সেইটিই আসলে সঙ্গীতের ভাবসম্পদ।

সঙ্গীত যেখানে শুদ্ধ সুরবিহার মাত্র নয়, বাংলা গানে যেখানে আমরা বাণীর প্রাধান্য দেখি, সেখানেও একথা মনে রাখতে হবে যে, বাণীর ভাবের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য সৃজন করতে গিয়েও সামগ্রিক ধ্বনিসুষমার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয়। গানের বাণী-সুর ও ছন্দের মত অপর একটি উপাদান মাত্র। আর,

> ''গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। ... বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।"[৬]

সুরবিযুক্তরূপ গানের বাণীতে সঙ্গীতের পূর্ণশ্রী বিকশিত হতে পারে না। কাব্যাংশের বাগার্থ এবং ছন্দ ও অলঙ্কারাদি জনিত ব্যঞ্জনা এক বিশেষ ধরনের। আবার, সুরারোপিত রূপে, সঙ্গীত হিসাবে, তার ব্যঞ্জনা ভিন্নতর। কাব্যের সঙ্গে সঙ্গীতের এই ভেদ সুপরিজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা ও সুর' প্রবন্ধে বলেছেন —

> ‘‘গানের রস যেখানে পাই সেখানেই সঙ্গীত, কথার সঙ্গে তার বিশেষ মৈত্রী থাক্ বা না থাক্। ভালো কারিগরের হাতে শিল্পীত প্রদীপের মুখে শিখা জ্বলে উঠে উৎসবসভা আলোকিত করল। সেই শিখার আলোককে আলোই বলব, সেইসঙ্গেই গুণীর হাতে গড়া প্রদীপটাকেও বাহবা দিলে দোষের হয় না। বস্তুত প্রদীপটা আলোককেই সম্মান দিয়েছে, আর ঐ প্রদীপেরও মুখ উজ্জ্বল করেছে আলোক।’’[৭]

অর্থাৎ, গানের সঙ্গীতরূপই আসল, তবে বাণীর বিশেষ মর্যাদা থাকলে তাতে গানেরই সম্মানবৃদ্ধি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর মূল্য সম্পর্কে আমরা সচেতন। কিন্তু আলদাভাবে বাণীর সাহিত্যঋদ্ধি আলোচনা করতে গেলে, সে-আলোচনা সঙ্গীতের আলোচনা না-হয়ে কাব্যের বিচার হয়ে উঠবে। সঙ্গীতের অঙ্গ হিসেবেই বাণীর আলোচনা সঙ্গত হবে।

গানের পদে কবিতার নিখুঁত ছন্দ না-ও বজায় থাকতে পারে, সেই কথাটি এখানে মনে রাখতে হবে। যে-পদ সুরে ছন্দোময় গতি লাভ করছে, তাকে যে কবিতার ছন্দেও নিখুঁত হতে হবে, গানের বাণী সম্পর্কে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই রামপ্রসাদ বা নিধুবাবুর পদে যেমন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতেও সর্বত্র দৃঢ়নিরূপিত ছন্দ পাওয়া যায় না। অথচ গান হিসেবে সে-রচনা হয়তো অতুলনীয়। যেমন —

ক) বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি

খ) প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

গ) ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির পরে

ঘ) শুভ কর্মপথে ধর’ নির্ভর গান

ঙ) চিত্ত পিপাসিত রে

চ) হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে

ছ) তোমার শেষের গানের রেশ

জ) তিমির দুয়ার খোলো — ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের হিন্দীভাঙা পদে বিশেষ করে প্রচলিত বাংলা ছন্দরীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় —

ক) তব অমল পরশরস

খ) নাথ হে, প্রেমপথে

গ) মোরে বারে বারে ফিরালে

ঘ) নিকটে দেখিব তোমারে

ঙ) রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে

চ) একি এ সুন্দর শোভা

ছ) পিপাসা হায় নাহি মিটিল - ইত্যাদি।

সে-ছাড়াও আমরা বেশ কিছু ছন্দছুট গান দেখতে পাই। উচ্চারণের সময়ের বাঁধা মাপ খুঁজে না পেলেও ধ্বনির সুবিন্যস্ত ঝঙ্কারে, কখনো বা আকস্মিক অনিয়মিত অত্যানুপ্রাস বা পদমধ্যবর্তী অনুপ্রাস ব্যবহারে এবং ভাবের সুষমার দরুণ এইসব গানের বাণীকে অনেক সময় ছন্দোময় বলে বোধ হয়। যেমন —

নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ।।
মন্থর নব নীলনীরদ — পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহ কান্তারে।।

বা,

শুভ্র প্রভাতে
পূর্ব গগনে উদিল
কল্যাণী শুকতারা।।
তরুণ অরুণ রশ্মি
ভাঙে অন্ধতামসী
রজনীর কারা।।

সব সত্ত্বেও, বিষয় মাহাত্ম্যে অর্থাৎ বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যে এবং বক্তব্যপ্রকাশের শিল্পগুণে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি স্বতন্ত্র চরিত্র আছে। বক্তব্যের ঋদ্ধি সেইজন্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদের অন্যতম উপাদান। সুর-ছন্দের যোগে সে-বক্তব্যের ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পায়, তিনের সমন্বয়ে জাত ভিন্ন এক শিল্প-নিছক বক্তব্যটুকুতে অন্য মাত্রা যোজনা করে। কেবল কথা নয়, কেবল সুর নয়, উভয়ে মিলে সুষম চলায় একটি কোনো বোধ সার্থকভাবে ব্যঞ্জনা পেলো। উভয়ে সেখানটাতে পরস্পর মিলল — সেটা হচ্ছে সুষম চলা, গতির ভঙ্গি, ছন্দ। তাই, গানের এই চলার সঙ্গে বক্তব্য বা গানের পদের,

ছন্দের কোনো যোগ নেই। গানের ছন্দের ভিন্ন গতি — তার আপন গতি, যাকে প্রচলিত ভাষার বলি তাল-লয়। চতুর্মাত্রিক ছন্দের কবিতার গানে তিন মাত্রা পর্বের চাল যেমন —

ক) আমি তারেই জানি তারেই জানি

খ) অশ্রুনদীর সুদূর পারে

গ) মধুর, তোমার শেষ যে না পাই

ঘ) আমাদের যাত্রা হল শুরু

ঙ) ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই

চ) একলা ব'সে হেরো তোমার ছবি

ছ) যদি তোর ভাবনা থাকে ইত্যাদি।

ষান্মাষিক ছন্দের পদের গানে কখনো চার মাত্রা যেমন —

ক) নাই নাই ভয়

খ) জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে

গ) কেটেছে একলা বিরহের বেলা

ঘ) তোমার অসীমে প্রাণময় লয়ে

ঙ) ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী ইত্যাদি।

কখনো সাত মাত্রার চাল যেমন —

ক) বাজাও আমারে বাজাও

খ) দাঁড়াও আমার আঁখির আগে

গ) তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে

ঘ) আমার বিচার তুমি করো ইত্যাদি।

কখনো পাঁচ মাত্রার চাল যেমন —

ক) প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী

খ) যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার

গ) ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও

ঘ) চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে দুই যোগ তিনের পদক্ষেপ হিসেবে, দশমাত্রার ছন্দকেও পাঁচমাত্রা বলা হল।

কি নয় মাত্রার চাল যেমন —

ক) প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে

চার মাত্রার পদে নানা বিষয় তাল হামেশাই দেখা যায় যেমন —

ক) আজ জ্যোৎস্নারাতে — তেওড়া

খ) যেতে যেতে চায় না যেত — ঝাঁপ

গ) প্রতিদিন তব গাথা — সুর ফাঁক

ঘ) ওই রে তরী দিল খুলে — রূপকড়া ইত্যাদি।

আবার কবিতার চার বা তিনের মাত্রা গানেও সেই রকমের ছন্দেই রূপ পেলো, তেমন ঘটনাও বিরল নয়, যেমন

চার মাত্রায় —

ক) তুমি যে আমারে চাও

খ) তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে

গ) প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে

ঘ) শেষ নাহি যে ইত্যাদি

তিনের মাত্রায় —

ক) ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়

খ) কে গো অন্তরতর সে

গ) অরূপ, তোমার বাণী

ঘ) যিনি সকল কাজের কাজী ইত্যাদি।

তবে কবিতার ছন্দ গানে বজায় থাকবে, এমন কোনো কথা নেই, গান আপন ভাব চলার ছন্দ আপনি ঠিক করে নেবে এই রীতি। মোটকথা এই যে, গানের ছন্দ পদ অংশের ছন্দের অনুগামী নয়, বরং বাণীর ভাব ও সুরের ভাবের যুগল চলনই গানের ছন্দ। গানের পদে ভাববিন্যাসে যে ছন্দ সার্থক, সুরারোপের সময় সেই ছন্দের পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। সুরের বিহারের জন্যে উপযুক্ত অবকাশের এবং ভাববিকাশের অনুকূল গতি খুঁজতে গিয়েই গীতিকার উপযুক্ত ছন্দ বেছে নেন। একই কথা একই সুর, ছন্দের ভিন্নতায় ভাবে অন্য আমেজ নিয়ে আসতে পারে, এমনও সৃষ্টির

নিদর্শন রবীন্দ্রনাথে আছে। যেমন, 'আমার নিশীথরাতের বাদলধারা' গানটির দাদরা ও কাহারবা এই দুই ছন্দের রূপ। তাছাড়া একই কথা ভিন্ন সুর ভিন্ন ছন্দে ভাবের কত পার্থক্য প্রকাশ করে, তারও দৃষ্টান্ত কম নেই। যেমন, 'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে', 'বসন্তে - বসন্তে তোমার কবিরে দেও ডাক', 'লক্ষী যখন আসবে', 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো' ইত্যাদি। আবার একই সুর-ছন্দ দুই ভিন্ন গানে ব্যবহার হয়েছে, যেমন, 'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা' এবং 'অশান্তি আজ হানল একি দহনজ্বালা', 'দূরের বন্ধ সুরের দূতীরে' এবং 'কোন দেবতা সে কী পরিহাসে,' 'আমার এই রিক্ত ডালি' এবং 'বাকি আমি রাখব না কিছুই', 'চলে ছলোছলো নদীধারা' এবং 'দেখো দেখো শুকতারা' ইত্যাদি।

সঙ্গীতরূপে সুর-ছন্দের উপর গানের বক্তব্যকে কতখানি নির্ভর করতে হয়, সে—সম্পর্কে সমস্ত কথা মনে রেখেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। কবির 'গীতবিতানে'র পর্যায় বিভাগ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে কবির তিরোধানের পর প্রকাশিত 'গীতবিতানে'র তৃতীয় খণ্ডের (১৩৫৭ আশ্বিন) প্রথমে বিন্যাস করা আছে 'গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য', তারপর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' তারপরে বিবিধ নাটকে ব্যবহৃত 'নাট্যগীতি' এরপর 'জাতীয় — সঙ্গীত', 'পূজা ও প্রার্থনা', 'আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত', 'প্রেম ও প্রকৃতি'।

গানের এই বিভাগের প্রতি লক্ষ্য করলে কোনো কোনো গান সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে একান্তভাবে এই পর্যায়ে কেন, এ গানকে তো অন্য শিরোনামের গীতগুচ্ছেও সন্নিবিষ্ট করা যেত।

যেমন — 'আমার যদি বেলা যায় গো বয়ে জেনো জেনো / আমার মন রয়েছে তোমায় লয়ে' এই গানটিকে একান্ত প্রেমের গান বললেন কেন কবি? যাত্রীরা সব নানান পথে কলরব করতে করতে চলে গেল। কথক পথের ধারে আসন পেতে 'তাঁর' জন্য মালা গাঁথছেন বসে। উদ্দিষ্টের কাছে তাঁর নিবেদন — জেনো, আপন হাতে এই সাজি ভরার মধ্য দিয়ে তোমার অভিমুখে আমার গোপন চলা। 'খেয়া' কাব্যের কবিতার সঙ্গে এই বাণীর কে না তুলনা করবেন? সে কাব্যেও তো এমনি পূজার ধারা। তবে এই গানটি 'প্রেম' পর্যায়ে এলো কি করে? প্রেমিকের জন্য সাজি ভরে যে প্রেমাস্পদ একান্তমনে পথ চলছে, সে পথের যাত্রী, দেখি সে একা নয়। নানান পথে কলরব করতে করতে অন্য যাত্রীরা ভিড় — সেই পরম একের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না কি।

'আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে' গানটিতে নায়িকার প্রাণ জলধারার কলস্বরে উতল হয়েছে 'জলকে যাবার জন্য। সমস্ত প্রাণ আজ বলছে — আজ যেন কার সাথে তার চেনা হবে — ফলে, ফিরে আসা ঘটবে কি না জানা নেই। যাত্রা কি তবে নিরুদ্দেশের পথে? গানটিতে আরও সংবাদ আছে 'প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া'। 'বিজন পথে' অভিসার যাত্রার উপযুক্ত অবসরও মিলেছে বটে। প্রেমকাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বাংলার চিরন্তন 'গাগরি ভরণে' যাবার প্রসঙ্গও উপস্থিত। আরও ব্যাপার এই যে, যার সাথে আজ 'চিনা' হবে মনে হচ্ছে সেই অচেনা জন ঘাটেরতরীতে বসে বসে বীণা বাজাচ্ছে। গানে তাকে 'সেই অজানা' বলা হল। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যে আমাদের বহু পরিচিত 'অজানা' আভাসিত হল এখানে। নায়িকার আগে দেখা কোনো অজানা পুরুষের কথা এখানে বলা হোল কি? মনে সংশয় জাগে। কেন না রবীন্দ্র-রচনায় আমরা সেই এক অজানাকে যে বড্ড দেখেছি ঘাটের তরীতে ব'সে যে সুরে সুরে মন ভোলায় — নিরুদ্দেশের পথে ডাক দিয়ে যায়। চিররহস্যের অবগুণ্ঠনে তার মুখাবয়ব ঢাকা। তার ঠিকানা জানা যায় না। কেবলি কি এক অদৃশ্য ডোরে বেঁধে সে টেনে নিয়ে যায় কবিপ্রাণকে অনির্দিষ্ট দূরান্ত।

এ তবে কি নিতান্তই একটি প্রেমের গান? 'সেই অজানা' কথাটুকুর জন্য এ গানকে তো 'পূজা' পর্যায়েরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু তা করলে, গানটিকে 'প্রেমে'র গান ভাববার পক্ষে যে যুক্তিগুলো আছে, সেইগুলো উপস্থিত করে কেউ যদি একে প্রেমের গানই বলেন, তা হলে তাকে নিরস্ত করা কঠিন হবে।

চিররহস্যময় চিরন্তর সৌন্দর্য বলে তাঁকে ধরে, আবার যদি 'পূজা' পর্যায়ে এ গানকে স্থান দেওয়া যায়, তবে তো বলা যেতেই পারে চরম সৌন্দর্যের সাধনাই কবির পূজাপদ্ধতি। তাঁর গানে তো অন্তত পরম সুন্দরের সঙ্গে পূজার্হের ভেদ তেমন করে চোখে পড়ে না। তাঁর বাঁশি বাজে বজ্রে, সে সহজ গান নয়, তিনি দুঃখরূপীও বটে। আরো দেখি নক্ষত্রখচিত সুন্দর অঙ্গদধারীর খড়্গটি সৌন্দর্যে আরো মনোহর, এমন কি 'চরম শোভায় রচিত'। তাঁর রুদ্রবেশের ভ্রূকুটি কুটিল খেলায় সুন্দরের দর্শনপ্রার্থী ফুলগুলো ঝড়ের আঘাত খেয়ে লুটিয়ে পড়ে। তবু এই রুদ্রকে সুন্দর বলতে তিনি পরাঙমুখ নন। বরং দুঃখরূপীর কাছে তাঁর প্রার্থনা — 'মৃদুসুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ করো না'।

'প্রেম' পর্যায়ের আর একখানি গান — 'সময় কারো যে নাই, ওরা চলে দলে দলে' — জাগ্রত

বিশ্বকোলাহলের মাঝখানে কবির গান শুনবার সময় নেই কারো। কীর্তিসৌধ নির্মাণেই ব্যস্ত সকলে। অকাজের বাঁশির প্রতি বর্ষিত হচ্ছে তাদের বিদ্রূপকটাক্ষ। সঞ্চারীর বাণীতে কবির গানের একলা শ্রোতার খবর পেয়ে, 'প্রেম' অধ্যায়ে সাজানো গান বলে, হঠাৎ মনে করি, এ বোধহয় সেই তাঁর কথা যাকে প্রথম যৌবনে 'জীবনের ধ্রুবতারা' বলে বুঝেছিলেন, নিখিলের রসের মূর্তি প্রত্যক্ষ করতে শিখেছিলেন যাঁর কাছ থেকে, নয়নের সম্মুখে না থাকলেও যাঁর স্থান বলেছেন নয়নের মাঝখানে।

'ওরে, কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে' — আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন করবার পর বিকৃতি চলেছে 'পথের বঁধু দুয়ার ভেঙে পথের পথিক করবে তোরে', তারপর সাধককে দুঃখের শিখার প্রদীপ জ্বেলে 'সকল দিয়ে' ভরে দিতে হবে পূজার থালা। তাতে জাবন মরণ এক ধারায় মিলে গিয়ে তাঁর চরণে আপন-হারা হবে। আর তখনই তাঁর স্পর্শ পেয়ে মোহবন্ধন হয়ে উঠবে, যেন প্রেমের ডোর। এমন প্রেমের সাধনা বৈষ্ণবের সাধনার সঙ্গে মিলে যায়।

'পূজা' পর্যায়ের বাউল ভঙ্গির গান — 'না রে, না রে, হবে না তোর স্বর্গসাধন' — এই রকমের কথা পেয়েছি —

''পথিক বঁধু পাগল ক'রে পথে বাহির করবে তোরে —

হৃদয় যে তোর ফেটে গিয়ে ফুটব তবে তাঁর আরাধন।''

এইসব গানে প্রেম, লৌকিক প্রেম নয় একেবারেই। প্রেম ফিরে ফিরে হয়ে উঠছে আরাধনা।

প্রেমের পথেই অরূপরতনের সন্ধান চলছে, বলে মনে হয়। 'সর্বনাশের আশায়' বসে থাকা যথাসর্বস্ব নিয়ে। আশা যেহেতু সর্বনাশের তাই সাধারণ অর্থে পাবার কিছুই নেই এখানে। দেখাও পাওয়া যাবে না তার, অথচ কেবল, সে যে পাগল করে পথে বাহির করবে — পথে ভাসাবে তারই অপেক্ষা। সত্য মিথ্যা কে জানে সে নাকি আড়াল থেকে ভালোবাসে। তাই আঁচ করে ধরে নিয়ে 'গভীরের ভালোবাসয় মজে থাকা এক আশ্চর্য রঙীন নেশা। তারই সঙ্গে প্রাণের খেলা, তার রঙে রঙেই সকল কালো — ধলোকে রঙে রাঙা করে তোলা, মনকে করে তোলা টলোমলো রাঙা কমল।

'অরূপরতনে'র আর একটি গান 'গীতবিতানে' আগের গানটির কাছাকাছি বিন্যাস করা রয়েছে। 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী' গানটিতেও একাগ্র নিবেদিত পূজার ভাব —

''তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন, যেথা তোমার ধুলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার — তোমার রাগে অনুরাগী।।"

আবার — 'যে পঙ্কে ওই চরণ পড়ে তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি।।' তাঁর চরণের রঙের সঙ্গে বসনভূষণ শয়নস্বপনের ভেদ না থাকবার আনন্দ, তাঁর বক্ষে ভক্তের রঙ গ্রহণীয় হোক। এই প্রার্থনা, এবং তাঁর উত্তরীয় ভক্তের হৃদকমলের রাঙা রেণুর রাগে রঞ্জিত করার সাধ– গানগুলোকে প্রেমপূর্ণ ভক্তির রসে বিকশিত করেছে।

'প্রেম' পর্যায়ে এমন গানও আছে, যাতে ভক্তের প্রেমও যে ত্রিভুবনেশ্বরের চাই এমন ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। তিনিও চাইছেন নিজে অরূপ থেকেও প্রেমের মালা দুলিয়ে দিতে ভক্তকণ্ঠে– 'চাঁদের মতন অলখ টানে' প্রেমিক হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুলতে।

এ অরূপ লীলা। আর এই লীলাস্থলেই তিনি দেখা দেন 'বিদেশিনী' রূপে। সিন্ধুপারবাসিনী বিচিত্ররূপিণী, যাঁকে হৃদমাঝারেও দেখতে পাওয়া যায়, ভুবন ভ্রমণশেষে যাঁকে প্রাণ না সঁপে কবির উপায় থাকে না।

বস্তুত সৃষ্টিধর্মী রচনার পংক্তিবিন্যাস করতে গেলে, সকলভাবের প্রতি সুবিচার করা কঠিন হয়। ভাবুক অন্তরের গহনে এক ভাব কখন অন্যভাবের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়, তার ঠিকানা থাকে না। এক চিত্তের কত রহস্য কত পথে কত রূপে উৎসারিত হয়ে চলে তার মধ্যে এক জীবনের কত বিচিত্র উপলব্ধির সমাবেশ। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কালে সব সময়ে মন একটি ভাবেই ভাবিত থাকতে পারে না। এইজন্যই বোধহয় পর্যায় বিন্যাসে অসুবিধা দেখা দেয়।

যেমন, 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' রচনাটিকে প্রেমের গান বলা হয়েছে। 'ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো'– 'পাগল হাওয়া'র এই প্রণয়ভাবের জন্য কি? না কি গানটিতে প্রেমের পরিবেশ চিত্র রয়েছে বলে? প্রকৃতির বর্ণনাই এতে প্রধান বলে 'প্রকৃতি' পর্যায়ের প্রথমদিকে বিন্যস্ত সাধারণভাবে প্রকৃতি বিষয়ক নয়টি গানের দশম গানও এটি হতে পারত। এই গানে অভিব্যক্ত 'পাগল হাওয়া'র প্রেমিক ভাবের সঙ্গে প্রকৃতিবিষয়ক অন্যান্য গানে ইতস্তত ব্যক্ত প্রণয়লীলার কল্পনার যোগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন– 'পথ-ভোলা' পথিক বসন্তের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলার চামেলি, সকালবেলার মল্লিকা, আমের মঞ্জরী, মাধবী, তরুণ করবীর, মাধবী-মালতীর সঙ্গে পথিকরূপী বসন্তের, উতল হাওয়ার সঙ্গে প্রদীপ শিখার, ফাগুণ সন্ধ্যার চাঁদের আলোর সঙ্গে তরুশাখা ও পল্লবের, বেণুর সঙ্গে

দখিন হাওয়ার, প্রণয়লীলার কথা 'প্রকৃতি' পর্যায়ের গানে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

কেবল তা নয়, প্রকৃতির চঞ্চলছন্দে নিখিলের যে হৃদয়স্পন্দন অনুভব করা যায়, তার সুরে সুরে কবি-অন্তর কম্পিত হবার কথা, ঘাসের ঝিলিমিলির সঙ্গে প্রাণের কাঁপন এতকালে মিলে যাবার কথা কতভাবেই বলা আছে। ধূলির পরে বসন্তের আদরের গান লেখা হয় যেমন, তেমনি কবি হৃদয়ে বসন্তের স্পর্শে মন্ত্রবলে ধরে গানের মুকুল। বিশ্ববীণা ধ্বনিতে যে বিশ্বনৃত্যের ছন্দহিল্লোল নিয়ত চলেছে আমাদেরকে ঘিরে কবি তার কথা ফিরে ফিরে বলেছেন।

এসব বলতে গিয়ে, নব শ্যামল প্রাণের নিকেতনে প্রথম যুগের বচন শুনতে পাবার কথা এসেছে। 'সুদূর আঁধার আদিকালে'কে যে কবে প্রথম বাঁশি বাজিয়ে 'প্রথম সুরে তালে' ডাক দিয়েছিল প্রাণকে, এসেছে সে প্রসঙ্গ। চির-চেনা এই পৃথিবীর আদি প্রাণলীলার সঙ্গে কবিপ্রাণের গূঢ় যোগটির কথা থেকে থেকে ব্যক্ত হয়েছে। 'বাদল ছোঁওয়া লেগে' যেমনি সবুজ মেঘে মেঘে' ঢেকে গেল মাটি– অমনি মনে পড়ে গেল তাঁর অমোঘ উচ্চারণ, 'ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা, ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা'। কবি দেখতে পান প্রকৃতির রূপসজ্জা ঋতুর পরে ঋতুতে ফুলের পরে ফুলে, ঘাসে। 'আকাশের মনের কথা' যখন 'ঝরো ঝরো' সঙ্গীতে কবির বুকের মধ্যে জেগে ওঠে তখনই বাতাসে বয়ে আসে 'যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা'। 'নূতন মেঘের ঘনিমা'র দিকে চেয়ে, কবির বক্ষে পুলকে দুলে ওঠে তাঁর 'পুরাতন হৃদয়'।

প্রকৃতি পর্যায়ে এমনি ক'রে বিশ্বরাগিনী ও বিশ্বজোড়া ঐক্যের অনুভূতি, চিরপ্রাণের লীলা এবং চিররহস্যময় নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের জন্যে ব্যাকুলতার গানও পাই আমরা। মুহূর্তে মুহূর্তে সাজ খসাবার লীলা, আবার পুরাতনকে বিদায় না দিয়েই মন্ত্রগানে তার হৃদয়কে বিকশিত করে তুলবার খেলায় নবীন রাজার বিস্ময়কর দক্ষতার কথায় প্রকৃতির নিত্যরূপান্তরের কাহিনী শোনা যায়। বারে বারে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েও বসন্ত নবীন বেশে বারে বারে ফিরে আসে বকুল, পারুল, আমের মুকুল, শিমুল, কামিনী ফুল, শালের নবীন পাতার কাছে। প্রকৃতিতে এ খেলা নিরন্তর চলছে আমাদের চোখের উপর আর তাই এইসব গানের সাহায্যে মানবজীবনের জরা ও যৌবনকেও প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি লীলার অঙ্গ বলে দেখিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

'সুদুরের বীণার স্বরে' এমনি ক'রে হৃদয় মথিত হয় যাদের, তাদের জানা বাসার প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই, অলক্ষ্যেতেই ওদের লক্ষ্য। আরও আশ্চর্য হই যখন দিনশেষের আঁধার রাতি ওদের

কাছে কী করে যেন 'মনোহরণ' হয়ে ওঠে। অন্তর উদাস করা, বিহ্বল করা সুগন্ধ ভরা বসন্ত সুন্দর সুদূরকে মনে এনে দেয়, আর অতীত স্মৃতির তীরে কান্নাভরা বেদনা জাগিয়ে তোলে। কত সময়ে সুরের সঙ্কেতে পুঞ্জিত বেদনা জেগে ওঠে। কিন্তু এই বেদনা কার জন্যে? জানা নেই। তবে, যে বাণী জানাতে ইচ্ছে হয় তার কারণও নেই, অর্থও নেই কোনো। বাদল অন্ধকারের আড়ালে নিভৃতে কানে কানে জানাবার জন্য যে বাণী স্বপ্নের গভীর থেকে মনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তাই বলার অপূর্ব বেদনা অপূর্ব আকাঙ্খায় অনুরণিত হতে থাকে চারদিকে।

কুসুমের গন্ধ, বাঁশির গান, মর্মর মুখরিত হাওয়া থেকে প্রাণে কিছু গ্রহণ করে বসন্তের বোধের মধ্যে আপন বেদনাকে সঞ্চারিত করে দেবার আকাঙ্খা ধ্বনিত হতে শুনি কখনো কখনো। প্রার্থনা এই– 'তুমি কিছু নিয়ে যাও। বেদনা হতে বেদনে'। এই সব বেদনাতে প্রধানত লক্ষ্য করি সংবেদনশীলতা। এ আবার আরেক রকমের বেদনা।

স্মৃতিবেদনার গান 'প্রকৃতি' বিভাগে ষোলো-সতেরো খানা সহজেই চোখে পড়ে। প্রকৃতিই কেবল এই সব গানের সবটুকু জুড়ে নেই। তার অনেকগুলির মূলে ব্যক্তিজীবনের বেদনার সঞ্চরণ লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বেদনা 'ব্যাপিয়া যায়' 'বেণুবনমর্মরে মর্মরে'। অপর পক্ষে, 'তার' 'না-বলা কথার বেদনা' শ্যামল তমালবনের ঘাসে চলার পথে পথে বাজতে থাকে। তখন, ওই ব্যাপ্ত বেদনা একটি কেন্দ্রকে নির্দেশ করে গূঢ় তাৎপর্যে পূর্ণ হয়ে উদ্বেলিত করে তোলে অসীম রোদন।

এই সমস্ত বেদনাকে মাঝে করে দিয়েছে শূন্যতা নির্দেশক হাহাকার। নব বসন্তের যাবতীয় সম্ভারে যখন চতুর্দিক পরিপূর্ণ। 'মধুর সুগন্ধে আকুল ভবন'– তখন কবির প্রার্থনা–

হা হা করিছে মম জীবন।
এসো এসো সাধনধন,
মম মন করো পূর্ণ আজি।।

প্রাকৃতিক পরিবেশ কবির অন্তরকে যেমন পূর্ণ করেছে, এখানে তেমন নয়। পূর্ণতার ভিন্নতর সাধনা এ গানে দেখা যাচ্ছে।

বর্ষার ময়ূর-মাতনের কথা অবিরত শুনে আবার এমনও শুনতে হয়–

ঝরে ঝরো ধরো ভাদর বাদর বিরহকাতর শর্বরী।

ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন কানন কানন মর্মরি।।

আমার প্রাণের রাগিনী আজি এ গগনে গগনে উঠিছে বাজিয়ে।

মোর হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে সমীরে সমীরে সঞ্চরি।।

ঘন মেঘের তিমিরে আবৃত হৃদয়ে বড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘনিয়েছে এখানে। শ্যামল মেঘে কার কামনার বেদনা। অশান্ত বায়ুতে কার কান্না, এমন কী বর্ষার প্রাকৃতিক ছবিটিই যেন বিরহির একটি বেদনা মূর্তি তুলে ধরেছে 'অশ্রুভরা বেদনা' গানে।

এই তিনটি প্রবল বেদনা-বোধের গান অবশ্য হিন্দী থেকে ভাঙা। মূল সুরে হাহা ধ্বনি থাকাতে বাণীতে এমন হাহা রব জেগেছে, এমন অসম্ভব নয়।

'প্রকৃতি' পর্যায়ে বিন্যস্ত বেদনাজ্ঞাপক গানের প্রসঙ্গে দেখতে পাই, সঙ্গীত রূপটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে 'যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়' গানটির বক্তব্য অন্ধকারকে নাশ করে প্রত্যাশার কণ্ঠকে রোধ করতে চায়। শ্রাবণ দিনশেষের মেঘসজ্জা যে অন্ধকার ঘনিয়ে আনে তাতে মনকেও আশঙ্কায় আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। সন্ধ্যা, আশ্রয়ের এবং মিলনের একটা আশ্বাস আনে এমন কথা রবীন্দ্র-কাব্যে সর্বদাই শুনতে পাই, মেঘঘটাও বিরহ সঞ্চার করে মিলনের আকাঙ্খাকে প্রবল করে। একসঙ্গে এই দুইয়ের সংস্থানে অবশ্য আশার চাইতে আশঙ্কার উদ্রেক বাস্তব করণেও অসঙ্গত নয়।

আলোচনার এই বিচিত্র পথ পরিক্রমা করে দেখা গেল 'প্রকৃতি' পর্যায়ে বিন্যস্ত গীতগুচ্ছও একান্তভাবে প্রকৃতি বিষয়ক নয়। এইসব গানে এসেছে সারাটি জীবনে উপলব্ধি বিচিত্র সত্য– যার প্রকৃতি নির্দেশ করে বিশেষ কোনো ভাবের কোঠায় তাকে আলাদা করে রাখা যায় না। এমন কী একই গানকে একাধিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'গীতবিতান' তৃতীয় খণ্ডের 'পূজা ও প্রার্থনা' বিভাগে কিছু গান আছে যেগুলোকে সাধারণ আচার অনুসারী ধর্মভাবের গান বলে মনে হয় না, 'গীতবিতান' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে 'পূজা' অঙ্গের 'অন্তর্মুখে'– 'একমনে তোর একতারাতে', 'জীবন যখন ছিল ফুলের মত', 'আত্মবোধন'– 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই', 'নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি', 'জাগরণ'– 'পূর্ব গগনভাগে দীপ্ত হইল সুপ্রভাত', 'মন, জাগ' মঙ্গললোকে'– এই উপশাখায় কিছু গান দেখছি, যেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে সেগুলোর সঙ্গে পূজার প্রত্যক্ষ যোগের কথা জোর দিয়ে বলা কঠিন। যেমন, 'বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই' গানটি 'পূজা' পর্যায়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই গানকে 'আত্মবোধন' শিরোনামে স্থাপন

করেছিলেন এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে মূল শিরোনাম ছিল 'পূজা' ওই শাখাতেই 'তুই কেবল থাকিস সরে সরে' গানটিতে আপন হ'তে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়াবার কথা। 'নদীপারের' আষাঢ় প্রভাতকে আপন প্রাণে ভরে নিয়ে প্রকৃতি ও পরিপার্শ্ব থেকে সৌন্দর্যকুসুম চয়ন করে আপন চেতনাকে আলোর মালা গেঁথে তুলবার কথা বলা হচ্ছে, 'আত্মবোধনে'র আর একটি গানে। এই গানগুলোর সঙ্গে প্রচলিত পূজা প্রার্থনার যোগ অনুধাবন করা কঠিন।

তৃতীয় খণ্ডের কয়েকটি ভাঙা গানের আলোচনা করা যেতে পারে, যেগুলোতে পরিষ্কার কোনো অর্চনা বা নিবেদনের ভাব দেখা যায় না। মনে হয়ে, হয়তো মূলগানে পূজাভাব ছিল বলে এগুলিকে পূজার গান বলে ধরা হয়েছে। ব্রহ্মোপাসনার জন্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরে কথা বসিয়ে গান রচনার রীতি ছিল বলে, এ গান কয়েকটিও পূজার গান হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। যেমন 'মন, জাগ' মঙ্গললোকে' এবং 'পান্থ, এখনো কেল অলসিত অঙ্গ' এই ভাঙাগান দুটিকে 'পূজা' পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজে।

কবির আপনার মধ্যে দ্বিতীয় সত্তা হিসেবে যে প্রভুর, যে রাজার অস্তিত্ব, তিনি মানবসাধারণের ধারণাসম্মত উপাস্য দেবতা নন। আপনাকে বিশ্বের মাঝখানে মেলে ধরে জীবনের উপলব্ধিই যে কবির পূজা, দূরের ডাকে পথে চলাই যাঁর শ্রেয়ের সাধন, যাঁর আত্মবোধন আপনাকে জানার সঙ্গে সঙ্গে 'তাঁকে' চেনা, যিনি প্রাণের মানুষকেই সকলখানে দেখতে পান, তাঁর উপলব্ধির ধরণ এত অভিনব যে তাঁর নামকরণ করা দুষ্কর। মানুষের ধর্মই তাঁর ধর্ম বলে তাঁর পূজা প্রচলিত পূজার থেকে এত আলাদা। সেইজন্য তাঁর প্রেমও প্রায়শ পূজারই অঙ্গ, কারণ, তা মানবজীবনেরই অন্তরঙ্গ। তাঁর পূজার স্বরূপ অনুধাবন করা যায় নিচে উদ্ধৃত কাব্যাংশ থেকে –

"... আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,– আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য– ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে

মানবলোকে,

আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে।

আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।”[৮]

এই আত্মার ইতিহাস তিনি শুনিয়ে রেখেছেন বলে সাধারণ পূজা সংক্রান্ত ধারণার গণ্ডিতে তাঁকে বাধা যায় না। জীবনের কোনো কোনো সময়ে বিশেষতঃ প্রথম ভাগে তিনি উপাসনার উদ্দেশ্য গীত রচনা করেছেন। নিজেই বলেছেন–

‘‘শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,

পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,

কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।

তিনি আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে

পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।”[৯]

কিন্তু তবু, বারে বারেই ‘রীতিবন্ধনে’র বাইরে তাঁর ‘আত্মবিস্মৃত পূজা’ মহামানবের চরণোদ্দেশ্যেই ‘উৎসৃষ্ট’ হয়েছে। সে অর্থে ধরতে গেলে তাঁর সমস্ত গানকেই পূজা বলতে পারি– কারণ, তা ‘মানুষ’ এর জন্য নিবেদিত।

তাই ‘গীতবিতানে’ তাঁর গানের পর্যায় বিভাগে শেষপর্যন্ত মন তৃপ্ত হয় না। প্রতিটি গান এক একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলে, স্বতন্ত্রভাবে গানগুলোর অবস্থানই যেন ভালো, এই আমাদের মনে হয়। কবিতার ক্ষেত্রে প্রেমের কবিতা, পূজার কবিতা বলে সৃষ্টি করে তাঁর কবিতাকে বিন্যাস করা যেমন চলে না, পরের দিকের কাব্যে কেবল সংখ্যা নির্দেশ করে কবিতা সাজানো হয়েছে যেমন, গানের ক্ষেত্রেও সেই রকমটি হওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে কবিমানসের কিছু মৌল কথা পাওয়া যায় রহস্যের বোধ এবং অজানার অবগুণ্ঠন মোচনের আকাঙ্খা রবীন্দ্ররচনার একটি স্থায়ীভাব। মনের মধ্যে গড়ে তোলা এক আদর্শকে বস্তুজগতের কোথাও আরোপ করতে না পারার বেদনা, আবার, কোথাও যাকে পাওয়া যাবে না। তারই মূর্তি মনের মধ্যে গড়ে তুলতে পারার ফলে এক আশ্চর্য আনন্দ অনুভূতি তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সেই মূর্তিটিকে বরং অবগুণ্ঠনবতী করে রেখে বিচিত্র রহস্যের আনন্দ-আস্বাদনে তাঁর আগ্রহ। তাকে অপ্রাপণীয়া জেনে পরম কাঙ্খণীয়া ভাববার আনন্দে নিরন্তর সন্ধানে রত থাকাই তাঁর

বৈশিষ্ট্য। চির-অতৃপ্তির ভাব এইজন্য তাঁর মধ্যে প্রধান। আবার, যাকে পাব না তাকে খুঁজতে গিয়ে তার জন্যে যে নিবিড় ধ্যান তারই মধ্য দিয়ে প্রতিপদে তার পরিচয় পাবার নান্দনিক অনুভূতি। ফুলগন্ধে, বায়ুস্পর্শে, সুখকর ধ্বনিতে, অপরূপ দৃশ্যে তার আস্বাদন। ফলে তাঁর গানে না-পাওয়ার কথা যন্ত্রণাময় নয়।

বরং মানসরচিত সেই অন্তর্বাসিনী, চির-অপ্রাপণীয়া, সুদূরিকা বা বিদেশিনী থেকেও যে সম্পদের জানান দিয়ে যায়, তার পরিচয় গানে গেঁথে কবি আপনাকে ধন্য মানেন। কখনো কখনো লগ্ন আসে কিন্তু কেমন করে যেন বিফলে চলে যায়। একথা বলতেও সৌন্দর্যে মণ্ডিত বেদনার ভাবে মন ভরে ওঠে। সে গান শুনে আমাদের মন উদাস হয়ে গিয়েও কিছু পায়। এ পাওয়া মনে আরো সুর জাগিয়ে দেয়, স্রষ্টার অভিপ্রেত অতৃপ্তির বোধ আমাদের মনকে ঝঙ্কৃত করে তোলে। তখন, সুর দিয়ে কিছু যেন ছুঁতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ খুব ছোটবেলা থেকেই ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত এবং হিন্দি ধ্রুপদী গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবে একই সঙ্গে বাংলার একান্ত নিজস্ব সঙ্গীত সুধার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তারপর পদ্মাতীরে জমিদারী জীবনে এবং শান্তিনিকেতনে তিনি বাংলার সঙ্গীত জীবনের সঙ্গে আরও বেশী করে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। যে সমস্ত গান তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তা হল বাউল, কীর্তন। এছাড়া সারি, বাংলার নিজস্ব বিভাস রাগে এবং অন্যান্য সুরে কিছু গান আছে। এইসব গানের মধ্যে বাউলের প্রভাবই সবচাইতে বেশী। বাউলরা একটি বিসেষ সম্প্রদায়। বাঁধাধরা পথ তা সে জীবনেরই হোক আর আধ্যাত্মিকতারই হোক তা তাঁদের জন্য নয়। মুক্তপ্রাণের সহজীয়া সাধক এঁরা। এই ধরার মাঝেই অধরাকে খুঁজে নেবার ঐকান্তিক চেষ্টা। কিন্তু এই চেষ্টা কষ্টকর নয়– এই যাত্রাকাল আনন্দের। চির আনন্দময় পথে এঁরা মনের মানুষকে খুঁজে বেড়ায়। এই 'মনের মানুষ' দেহজ কোন মানব বা মানবী নয়। এই মনের মানুষ চির অধরা, চির অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিতা। জগৎ জোড়া তাঁদের ঘর। পৃথিবীকে এরা ছোট্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করেননি। চির রসের স্রোতকে দৈনন্দিনতার ক্ষুদ্র বাঁধ দিয়ে আটকে রাখেননি। ধরা-অধরার লুকোচুরি খেলা খেলতে খেলতে ধরার খেলা শেষ করেন।

আর এই আনন্দময় যাত্রাপথে এদের একমাত্র সঙ্গী সঙ্গীত। মনের কথা, প্রাণের কথা বলার একমাত্র মাধ্যম। এই দার্শনিকতা এবং জীবনবোধের সঙ্গে রবীন্দ্র দার্শনিকতার এক সূক্ষ্ম, গূঢ়, অন্তরমিলের ফধধারার আভাস পাওয়া যায়। তিনিও পথ ভোলা এক পথিক হয়ে মনের মানুষকে

সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছেন। সেই একলা চলা পথিক কখনো দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কখনো আপন গহন হৃদয়ের অচিনপুরে ডুব দিয়েছেন। উদাসী সুর, গ্রাম ছাড়িয়ে, রাঙামাটির পথ পেরিয়ে কোথায় ভেসে গিয়েছে তার হদিসেই রবি বাউলের একতারা সদাই বেজে চলেছে।

রবীন্দ্র জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর সঙ্গীতে ও দার্শনিক বোধে বাউলের প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছে। তবে এই প্রভাবের ফলশ্রুতি স্বরূপ যে নতুন শৈলীর জন্ম হয়েছে, তা কেবল বাউলাঙ্গ গানের বিশুদ্ধ অনুকরণ মাত্র নয়। বাউল গানের রুপ, রস, মাধুর্যকে তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক স্বকীয় উজ্জ্বলতায় ভাস্বর করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন–

> ''আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি।''[১০]

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর আগে বাংলাদেশ সহজ বা মানবীয় প্রেমের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরীয় অপার্থিব প্রেম আস্বাদনের সাধনার ধারা বর্তমান ছিল। বড়ুচণ্ডীদাস ও রজকিনী রামীর প্রেম সাধনার ইতিকথা নিয়ে আজও পণ্ডিতদের ভেতর মতদ্বৈধ আছে সত্য, কিন্তু 'সহজ' ভগবানের সাধক চণ্ডীদাস যে পরকীয়া সাধনায় প্রেমের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ শুধু বাংলাদেশে কেন সমগ্র বিশ্বের দরবারে রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। চণ্ডীদাস বলেছিলেন–

> ''সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।''[১১]

সহজ সাধক বাউলরা ভগবানের প্রেমে পাগল, তারা দেহের মধ্যে, সান্তের মধ্যেই অনন্ত ভগবানের ধ্যান-ধারণা করে সীমার ভেতর দিয়ে অসীমের আনন্দকে আস্বাদন করতে চায়। তারা সাকারের করে পুজো, কিন্তু নিরাকারকেও করে না অস্বীকার, কেননা তারা জানে সাকারের পাশেই থাকে নিরাকার, ছায়ার পাশেই থাকে কায়া।

বাউলমতের আলোচনায় আমরা বাউলকে সাধারণভাবে বলি বাংলার বাউল। অবশ্য বাংলাদেশে বাউল দর্শনের বিশেষ স্থল হলেও বাংলার বাইরেও যে বাউল দর্শনের যথেষ্ট প্রচার ছিল তা আলাউদ্দিন খিল্‌জি ও গোপাল নায়কের সময় বৈজুনাথ বা বৈজুবাওরাই তার বিশেষ উদাহরণ। মহারাষ্ট্রের সাধক জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানদেব, একনাথ এঁদের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাউল মতবাদেরও সাধক, মানুষের প্রতি ছিল তাঁর প্রাণের দরদ ও অফুরন্ত ভালোবাসা। 'গীতাঞ্জলি'তে তিনি বলেছেন–

ভজন পূজন সাধন আরাধনা

সমস্ত থাক্ পড়ে।

রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে

কেন আছিস ওরে।

মন্দিরের বেদীমূলে যদি দেবতা না থাকেন তো তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– মানুষের অন্তরে, মানুষের হৃদয় সিংহাসনেই তাঁর আসন পাতা আছে। বিশ্বজোড়া অন্তর নিয়ে বিশ্বকবি বলেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় সংগ্রামশীল ব্যথিত মানুষের অন্তর-বেদীমূলেই ভগবানের সিংহাসন পাতা আছে। নিশ্চেষ্টতার সুপ্তি কোনদিনই জাগরণ আনে না, চলার পথেই তো মেলে লক্ষ্যের সার্থকতা। অগণিত নরনারীর দেহসীমার মধ্যে তাই রবীন্দ্রনাথ অসীমের প্রতিষ্ঠাকে উপলব্ধি করেছিলেন, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন মুক্তির আস্বাদন, বৈচিত্র্য-সৃষ্টির মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন অখণ্ড ভগবানের বিকাশ। দেহতত্ত্ববাদী বাউল-সাধকরা ছিল তাঁর কাছে তাই পরমপ্রিয়। বাউলমতের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর The Religion of Man গ্রন্থে বলেছেন ঃ

> "The Bâuls do not believe in aloofness from, or renunciation of, any person or thing, their central idea is yoga, attachment to and communion with the divine and its manifestation, as means of realization".[১২]

সুতরাং এ কথা বলা বোধহয় অসমীচীন হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ বাউলদের প্রেম সাধনার ছিলেন একান্ত পক্ষপাতী, কিন্তু মনকে নিরুদ্ধ করে সীমাবদ্ধ ঘরের কোণে বসে মুক্তিলাভ করাকে তিনি বরং অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করতেন। তিনি বলেছেন–

"রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার"[১৩]

তাঁর অন্তরের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে তিনি আবার বলেছেন–

"যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে,

তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,

প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"[১৪]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাউলমতের মতো বৈষ্ণবমতেরও অনুগামী ছিলেন। বেদ, উপনিষৎ ও মুসলমান সুফী মতবাদগুলির সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর সাহিত্য ও কাব্যের রসধারা সেই মতবাদগুলিকে আরো পরিস্ফুট, আরো চাক্ষুস ও আরো রসসিঞ্চিত করেছিল। তার সঙ্গে তাঁর মধ্যে শিল্পসৌন্দর্য-দৃষ্টিরও সমাবেশ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গান তাই এতো সরস, এতো প্রাণস্পর্শী ও এতো আবেদনপূর্ণ। তাঁর কাব্য, সাহিত্য ও গান জন্মলাভ করেছিল এই পৃথিবীর মাটিতে, তাদের ভাষা, ভাব ও সুরও ছিল বিশ্বগতই, কিন্তু বিশ্বোত্তীর্ণের বাস্তব আনন্দকে নিয়ে তারা ছিল আসলে পরিপূর্ণ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মনে যে বাউলগানের পূর্ণস্পর্শ লেগেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর কথার মধ্যেই স্পষ্টভাবে। যেমন–

> ''শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলসুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে।''[১৫]

বাংলার বাউলগানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মরমী সাধক রবীন্দ্রনাথও তাঁর বাউলগান রচনা করেছিলেন স্বদেশ, সুখ-দুঃখ ঘেরা মানুষ ও ভগবান পাগল অধ্যাত্ম পথিককে উদ্দেশ্য করে। বাউলগানের সুর তথা রাগ-রাগিণীতে বাংলার মৌলিকতাই স্থান পেয়েছে– যেমন পেয়েছে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানে ও পরবর্তী কবি, তর্জা, পাঁচালী, গম্ভীরা ভাটিয়ালী, জারি, সারি প্রভৃতি গানে।

বিভিন্ন বাউল গানের সার্থক অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো বাউলাঙ্গের গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত এইসব বাউল গানে বিখ্যাত এবং প্রচলিত কিছু বাউল গানের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। যেমন– ''আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে'' এর অনুকরণে সৃষ্ট এই দুটি বিখ্যাত গান– ''আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'' এবং ''ও আমার মন যখন জাগলি নারে। তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।''

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট আরও কিছু বাউলাঙ্গের গানের একটি তালিকা উদ্ধৃত করা হলো–

১) আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে

২) আমারে কে নিবি ভাই

৩) আমি কান পেতে রই

৪) কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ

৫) তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে

৬) তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে

৭) তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া

৮) ভেঙে মোর ঘরের চাবি

৯) আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে

১০) এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে

১১) গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ

১২) ও আমার দেশের মাটি

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে এক প্লাবনের সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলার লোকগীতিকে শ্রদ্ধার সম্মান দিয়ে ভারতীয় অভিজাত সঙ্গীতের সঙ্গে তিনি মিতালী পাতিয়েছিলেন সৃষ্টির জগতে এক নবপ্রেরণার সঞ্চার করে, আর সেই প্রেরণা ও প্রাণপ্রবাহকে ধরে আজও তাই বাংলার শুধু নয়, সমগ্র ভারতের বুকে রবীন্দ্রসঙ্গীত তার আসন পেতে বসে আছে। তাঁর গান রচনার মধ্যে গোড়ার দিক থেকে শেষ পর্যন্ত যেমন ক্রমবিকাশের কতকগুলো ধারার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বিচিত্র রকমের রচনাশৈলীরও সন্ধান মেলে। এরকম গানগুলি হলো–

১) 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে'

২) 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'

৩) 'এবেলা ডাক পড়েছে'

৪) 'বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা'

৫) 'আমি কান পেতে রই'

৬) 'নিশিদিন ভরসা রাখিস'

৭) 'আমি তরেই খুঁজে বেড়াই'

এই বাউল গানগুলি বাংলার গীতি ভাণ্ডারের অপূর্ব সম্পদ।

বাউল ছাড়াও পূর্ববঙ্গের সারি প্রভৃতি গানের সুরে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী না হলেও কিছু গান রচনা করেছেন। পূর্ববঙ্গে সারি গান গাওয়া হয়ে থাকে ছাদ পেটোনো, নৌকা বাওয়া প্রভৃতি সারিবদ্ধ কাজ করার সময়। ফলতঃ এই গানের ছন্দ কিছুটা দ্রুতলয়ের। যেমন– ''এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে'', ''বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা'', ''আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়'' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের বাউলগানের কথায় যেমন কাব্যসম্পদ আছে, তেমনি আছে সুরের মাধুর্য ও লালিত্য। তিনি বাউলগানের ভাব নিজের জীবনের অনুভূতিলব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন যেমন বিলাস-ঐশ্বর্যের দিক থেকে সম্রাট তেমনি ছিলেন ত্যাগের দিক থেকেও মহাতপস্বী। দীন-দরিদ্রের ব্যথা-বেদনা তিনি অন্তর দিয়ে বুঝতেন, আর বুঝতেন বলেই প্রেমে পাগল করা বাউলগানকে করেছিলেন জীবনের অন্যতম সহায় সম্বল।

বাংলার বৈচিত্র্যময় লোকসঙ্গীতের মধ্যে কীর্তন গান রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কীর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

> ''কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সঙ্গীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত। জীবনের লীলা নদীর স্রোতের মত নতুন নতুন বাঁকে বিচিত্র। ডোবা বা পুকুরের মতো ঘের দেওয়া পাড় দিয়ে বাঁধা নয়– কীর্তনে এই বাঁধা ধরায় পরিবর্তমান ক্রমিকতাকে কথায় ও সুরে মিলিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিল।''[১৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানগুলোকে প্রেম উপাসনাপযোগী গান ও জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে রচনা করলেন। পরবর্তীকালে প্রেমসঙ্গীত ও ঋতুসঙ্গীত রচনা করেছিলেন এই কীর্তনের সুরে। রবীন্দ্রনাথ কীর্তন গানকে কেবলমাত্র ভক্তিরস ও ভগবৎ প্রেমের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেননি। কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে রসাল ভাবগরিমাটুকু যাতে প্রকাশ পায় সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মৌলিকতায় ভাস্বর। তাঁর কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতিতে তিনি ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু সমস্ত ঐতিহ্য উত্তরাধিকারকে অতিক্রম করে মৌলিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরূপে আমাদের সামনে বার বার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। হিন্দুস্থানী রাগপ্রধান গান, বিদেশী সঙ্গীতের, সুর, দেশী কীর্তনাঙ্গ, বাউল গানের ঐতিহ্য সবই তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ সবই তাঁর আপন সৃষ্টির ছোয়ায়

হয়ে উঠেছে স্বকীয়। এই জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের তুলনা কেবলমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত-ই। ঠিক এই কারণেই আমরা দেখি যে ভাষা, ভাব, সুর, তাল, গঠন বৈচিত্র্য যখন যেটুকু সৃষ্টির প্রয়াসে আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথ ততটুকুই গ্রহণ করেছেন। স্রষ্টার শান্ত নির্লিপ্তিতে তিনি মহান সৃষ্টির জন্য যা অপ্রয়োজনীয় তাকে বর্জন করেছেন। সহজ মিশ্রণে, সুর জটিল হয়ে রসবোধের ব্যাঘাত তো ঘটায়নি বরং একটি নিপুণ, নিটোল মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যায়। যেমন– ''নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে'', গানটিতে কীর্তনের সুরে রাগ ''যোগীয়ার'' ছোঁয়া লেগেছে। আবার ''হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল'' গানটিতে কীর্তনের সুর-বৈচিত্র্য ও রাগ ''বিভাস''-এর সঙ্গম ঘটেছেয তেমনি ''আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ'' গানটিতে ''বাহার'' ও ''পঞ্চমের'' সুর মিলে হয়েছে কীর্তন।

কীর্তন গানে গভীরতা, গাম্ভীর্য ও সাহিত্য সমৃদ্ধির আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন–

> ''বাঙালীর কীর্তন গানে সাহিত্যে-সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল – তাকে প্রিমিটিভ এবং ফোক্‌ম্যুজিক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরুহ, তার পরিসর হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহু শাখায়িত নাট্য রস আছে– তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।''[১৭]

বাংলদেশের কীর্তনগানের রসধারা তাঁর অন্তরে প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল। বাংলার চতুঃসীমা উত্তীর্ণ হয়ে কীর্তনগানের প্লাবন প্রবাহিত হয়েছিল দিল্লি, মথুরা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ বাদশাহী সঙ্গীতের পীঠস্থানগুলিতেও। বিচিত্র তালের ভঙ্গিমা কীর্তন গানের কলেবরকে পরিপুষ্ট করেছিল ও ছন্দায়িত করেছিল তার সুরকে। বাংলাদেশের প্রতিটি অনু-পরমাণুতে কীর্তনগানের রস ও ভাব হয়েছিল অনুবিদ্ধ। বাঙালি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মতো কীর্তনগানের মর্যাদাকেও দিয়েছিলেন সম্মান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে কীর্তন গানও পেলো সমাদর। বৈষ্ণব-পদকর্তাদের ভাবগরিমাকে তিনি সম্মান দিয়েছিলেন অকুণ্ঠভাবেই। তিনি মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তাঁদের রচনা লালিত্যকে– তাঁদের রস ও সৌন্দর্য সৃষ্টির নিপুণতাকে।

কীর্তনের ওপর তাঁর যে কী নিবিড় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল তা' দিলীপকুমার রায়কে লিখিত দু'খানি পত্র থেকে জানা যায়। প্রথম পত্রখানিতে কবি লিখেছেন–

''বাংলাদেশে কীর্তনগানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহি হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক। অথচ হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর উপাদান সে বর্জন করেনি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।''[১৭]

আবার দ্বিতীয় পত্রখানিতে (২৯।৭।১৯৩৬) তিনি লিখেছেন–

''কীর্তন-সঙ্গীত আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে কীর্তন সঙ্গীতে বাঙালির এই অনন্য। তন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।''[১৮]

তাঁর প্রাথমিক রচনা ভানুসিংহের পদাবলীই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদিও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বৈষ্ণবকাব্যের হুবহু অনুকরণ নয়, তবুও স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর এই পদরচনার ছন্দলালিত্যের মধ্যে পাই এক সুসঙ্গত বৈষ্ণব-কাব্যরসলোভী মনের একান্ত আকুলতা। স্বতঃস্ফূর্ত বৈষ্ণবভাবোচ্ছ্বলতাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি, আর পারেন নি বলেই তাঁর কয়েকটি রচনার ভঙ্গি বৈষ্ণব-পদ-কর্তাদের রচনা– সৌন্দর্যকে হুবহু অনুসরণ করেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ পদ নিদর্শন ঃ

''নাম সমেতং কৃতসংকেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহুমনুতে, নণুতে তনুসঙ্গ তপবনচলিত মপি বেণুম্।।
পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে, শঙ্কিত ভবদপুযানম্।
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম।।''

এই পদের শব্দঝঙ্কার নিয়ে কবিগুরু তাঁর নিপুণ-লেখনী দিয়ে বাংলাভাষায় রচনা করেছিলেন–

''সতিমির রজনী, সচকিত সজনী, শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য,

কলয়তি মলয়ে, সুবিজন-নিলয়ে, বালা-বিরহ-বিষণ্ণ।

তৃষিত নয়নে, বনপথ পানে, নিরখে ব্যাকুল বালা

দেখন পাওয়ে আঁখি ফিরাওয়ে, গাঁথে বনফুল মালা।।'' প্রভৃতি–

বৈষ্ণব ভাবামৃত তিনি আকুণ্ঠ পান করেছিলেন – যার জন্য তাঁর কবিতায়, গানে, সাহিত্য রচনায় ও নাটকের কোন কোন জায়গায় বৈষ্ণব ভাব গাম্ভীর্যের স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। তাছাড়া বৈষ্ণবদের বারমাস্য তথা বারমাসের সুখ-দুঃখ ভরা কবিতার মতো রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঋতুরঙ্গ নাটকে ছ'টি ঋতুকে সাবলীল ছন্দে বর্ণনা করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ বাংলার প্রচলিত কীর্তন গানের সঙ্গে রবীন্দ্র কীর্তনাঙ্গ গানের তাল বৈচিত্র্যের আলোচনা করতে গেলে দুটি প্রভেদ আমাদের প্রথমেই নজর আসে। প্রথমতঃ তালে কীর্তনের ছন্দ জটিলতাকে রবীন্দ্রনাথ সযত্নে পরিহার করেছেন। সাধারণতঃ ৬ মাত্রা (ঢিমে ও দ্রুত), ৭ মাত্রা, ৮ মাত্রা ও ১০ মাত্রার তালকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কীর্তনের তাল-ফেরতার ব্যাপারটিকে রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে গিয়েছেন। যদিও অন্যান্য গানে তিনি তাল ফেরতা ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এইবারে কীর্তনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ 'আখর' সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। রবীন্দ্রনাথ আখরকে বলেছেন 'কথার তান'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কীর্তনাঙ্গের গানে গায়কদের আখর রচনার স্বাধীনতা দেন নি। তাঁর যে স্বল্প কয়েকটি গানে আখর রয়েছে তা তিনি নিজেই লিখে দিয়েছেন এবং এই আখরগুলিও খুবই সংক্ষিপ্ত। এই আখরযুক্ত গানগুলো সবই তার অল্প বয়সের রচনা এবং এইসব গানে সুর যোজনার দিক দিয়ে তাঁর শিল্প ভাবনার বিশেষ কোন প্রকাশ ঘটেনি। এর থেকে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কীর্তনাঙ্গের গানে আখরকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। সত্যিকথা বলতে কি রবীন্দ্রসঙ্গীতে আখরহীন কীর্তনগানের সংখ্যাই অধিক। আখর বর্জিত বাউলের প্রভাবযুক্ত গানই হলো সত্যিকারের রাবীন্দ্রিক-কীর্তনগান। নীচে আখরযুক্ত ও আখরহীন কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত দেওয়া হল ঃ

আখরযুক্ত ঃ

১) আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি

২) ওহে জীবন-বল্লভ

৩) মাঝে মাঝে তব দেখা পাই

৪) আমি সংসারে মন দিয়েছিনু

৫) তুমি কাছে নাই বলে

৬) নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে

৭) কে জানিত তুমি ডাকিবে

৮) সুখে আছি সুখে আছি সখা, আপন মনে।

আখরহীন ঃ

১) যা হারিয়ে যায়

২) ওই আসনতলের মাটির' পরে

৩) আমারে কে নিবি ভাই

৪) সখী বহে গেল বেলা

৫) না চাহিলে যারে পাওয়া যায়

৬) খাঁচার পাখী ছিল

৭) আমার মন মানে না

৮) দিনের পরে দিন যে গেল

৯) গোপন কথাটি রবে না গোপনে

১০) আমার মল্লিকাবনে

১১) ভেঙে মোর ঘরের চাবি।

রবীন্দ্রনাথ কীর্তনগানে আখর যোজনাও করেছেন এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশেষ করে তাঁর ''ওহে জীবনবল্লভ ওহে সাধন। দুর্লভ'' গানখানিতে। তিনি তাঁর কোকিল বিনিন্দিকত কণ্ঠে নিজেও ঐ গানখানি গাইতেন।

তিনি গেয়েছেন–

''ওহে জীবনবল্লভ,

ওহে সাধন-দুর্লভ,

আমি মর্মের কথা, অন্তর-ব্যথা কিছু নাহি কব–

শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব।”

এরপর ভাবের আবেদনকে সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি এতে আখর যোজনা করেছেন এই বলে–

১) দিনু চরণতলে–

২) কথা যা ছিল দিনু চরণতলে–

৩) প্রাণের বোঝা বুঝে লও– দিনু চরণতলে।

আমি কি আর কব!

কীর্তনগানে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের আবেগ ও সুরের করুণ আবেদন কি রকম ছিল, যাঁরা তাঁর কণ্ঠে গান শুনেছেন তাঁরাই জানেন কত দরদী– কত মরমী আপনভোলা সাধক তিনি ছিলেন। এই ‘‘ওহে জীবনবল্লভ” কীর্তন-গানখানির শেষে তিনি নিজের উদ্দেশ্যেই যেন বলেছেন–

‘‘তবু ফেলো না দূরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে–

তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার।

মৃত্যু আধারভব।”

‘‘ভবের খেলা সাঙ্গ হ’লে” ভগবানের চরণে তাঁকে ঠাঁই দেবার জন্য তিনি আকুল প্রাণে আবেদন জানিয়েছেন।

কীর্তন গানের সুর অনুসারে রবীন্দ্রনাথের গান আরও অনেক আছে। যেমন–

‘‘আমি– সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি, আপনি সে মন নিয়েছ,

আমি– সুখ বলে দুঃখ চেয়েছিনু

তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ।”

তেমনি–

‘‘আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি

দিবস কাটে বৃথায় হে.....” প্রভৃতি।

কবির ‘পূজা ও প্রার্থনা’ পর্যায়ে এ ধরণের অনেক কীর্তন গানের অনুকরণে গান আছে যাদের সত্যই তুলনা হয় না। কবি সর্বজন পরিচিত বিশ্বকবি হলেও আসলে তিনি ছিলেন বাংলারই মরমী কবি, আর তাই বাংলার সরল স্বচ্ছ পরিবেশ ও শ্যামল সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর লেখনীতে প্রাণবাণ হয়ে

উঠেছিল বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, জারি, সারি প্রভৃতি গানের সহজ প্রাণস্পর্শী আবেদন। সার্থক কবির কাব্য ও সুর কল্পনা। বাংলার শুধু কেন, ভারতের সীমারেখা অতিক্রম করে বিশ্বের ব্যাপক দরবারে তাঁর গানের আবেদন সকল শ্রেণির মানুষকে আজ পাগল ও প্রেমমুগ্ধ করেছে।

আমাদের চলনে, বলনে এবং প্রকৃতির রূপ পরিগ্রহে ছন্দ তথা লয়ের আবির্ভাব সুস্পষ্ট। কাব্য, সাহিত্য এই ছন্দের প্রকাশ অপরিহার্য। সুতরাং কলাশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের উপর এর প্রভাব যে প্রকট এবং অপরিহার্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা কণ্ঠসঙ্গীত বলতে ভাষা, সুর ও ছন্দের একত্র সুন্দর সৃষ্টিকেই বুঝে থাকি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমরা জানি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরণ্যে এবং পৃথিবীর বহু মনীষী কর্ত্তৃক স্বীকৃত। তাঁর কাব্য মানুষকে এই পার্থিব জগতের বহু ঊর্ধ্বে এক নির্মল সুন্দরতম লোকে নিয়ে যেতে সক্ষম। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভাবরস মুখ্য। সুতরাং সুর তথা স্বরের মাধ্যমে ভাবের রস প্রকাশই তাঁর গানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে ছন্দ বা লয় এই সঙ্গীতে অপরিহার্য হলেও অন্যান্য সঙ্গীত যথা ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল অপেক্ষা এর স্থান গৌণ। রবীন্দ্রসঙ্গীত যেহেতু সুর সম্মিলিত কাব্য, তাই তালের স্থান সেখানে কাব্যের ছন্দের সঙ্গেই চলে। কবির মতে,–

> ''কাব্যে ছন্দের যে কাজ গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তালও সেই নিয়মে গানে চলবে।''[১৮]

তাল সম্পর্কে কবির আর একটি উক্তি হল–

> ''তালও ভাবপ্রকাশের একটি অঙ্গ। যেমন সুর তাল ও ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক – সর্বত্রই যে তাল সমান রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই। ভাব প্রকাশকে মুখ্য করে সুর ও তালকে গৌণ করলেই ভাল হয়।''[১৯]

প্রসঙ্গক্রমে, ''আরো আঘাত সইবে আমার'', ''অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে'', ''রূপে তোমায় ভোলাব না'', ''এসো শরতের অমল মহিমা'' ইত্যাদি বহু গান তালে আবদ্ধ না করে শুধু ভাবের প্রাধান্য দিয়েই পরিবেশিত হতে শোনা যায়। এর অর্থ এই নয় যে, প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ তালগুলিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। আড়াচৌতাল, ধামার, চৌতাল ইত্যাদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালে নিবদ্ধ বহু ব্রহ্মসঙ্গীত আজও বিশেষ সমাদৃত। যদিও উক্ত তালের বিভাগগুলি ভাতখণ্ডে পদ্ধতির তাল বিভাগের ছন্দের সঙ্গে কিছু কিছু অমিল পরিলক্ষিত হয়।

যতটুকু জানা যায় যদুভট্ট বিষমপদী তালের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন, তাই তাঁর শিষ্যের সৃষ্ট তালগুলির মধ্যেও বিষমপদী তালের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। উক্ত তালগুলিতে ফাঁক বা খালির স্থান নেই। রবীন্দ্র সৃষ্ট তালগুলি যথাক্রমে–

১) ঝম্পক – ৫ মাত্রা বিশিষ্ট। এই তালটি বহু পূর্বে প্রচলিত ছিল এবং পরে অপ্রচলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ আবার নতুন করে প্রচলন করেন।

২) ষষ্ঠীতাল – ৬ মাত্রা বিশিষ্ট।

৩) রুপকড়া – ৮ মাত্রা বিশিষ্ট।

৪) নবতাল – ৯ মাত্রা বিশিষ্ট।

৫) একাদশী তাল – ১১ মাত্রা বিশিষ্ট।

৬) নবপঞ্চ তাল – ১৮ মাত্রা বিশিষ্ট।

তাছাড়া কবিগুরু সুর তথা ছন্দের তাগিদে তালের কোন নাম উল্লেখ না করেও কিছু কিছু গান সৃষ্টি করে গেছেন। গানের ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের তালের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচিত হ'ল–

প্রথমেই ধরা যাক দুই মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগ যুক্ত তাল– ''সবারে করি আহ্বান'', ''মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে'', ''এসো নীপ বনে'' ইত্যাদি। আমাদের সঙ্গীতে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ভারতীয় সঙ্গীতে দুই মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগযুক্ত তাল খুব সম্ভবতঃ লঘু সঙ্গীতে নেই। কবিগুরু ভাব এবং সুরের প্রতি লক্ষ্য রেখে উক্ত গানগুলিকে ২/২ মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগ করেছেন। তবে উক্ত গানগুলির কোন সঠিক তালের নাম নির্দেশ করেন নি।

দ্বিতীয়ত – ২/৩ মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগ যুক্ত তাল তাকে আমরা ''অর্ধ-ঝাঁপতাল'' বলতে পারি। এই তালের গানগুলি যেমন– ''দীপ নিবে গেছে মম'', ''আমি কি বলে করিব নিবেদন''। এই তালে সম্ আছে কিন্তু খালি নেই। এই ছন্দ উত্তরী পদ্ধতিতে তিনি প্রবর্তন করলেও দক্ষিণী পদ্ধতিতে তিস্র ছন্দপ্রকরণে এই তালের ছন্দ পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত– উপরোক্ত তালের বিভাগের ঠিক উল্টো অর্থাৎ ৩/২ মাত্রা বিশিষ্ট তাল যাকে আমরা ''ঝম্পক'' তাল বলে থাকি। এই তালটিও আমাদের সঙ্গীতে নেই। তবে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে এই তালের প্রচলন দেখা যায়, অনেকে মনে করেন যে, দক্ষিণ ভারত থেকে এই তালটিকে

তিনি নিজের সঙ্গীতে প্রচলন করেন। গানের প্রকৃতি বা ধরণ অনুযায়ী তবলা, মৃদঙ্গ বা খোল ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ঝম্পক তালে রচিত কয়েকটি প্রচলিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম লাইন উদাহরণ হিসাবে নিচে দেওয়া গেল–

''বিপদে মোরে রক্ষা কর,'' ''নিবিড় অমা তিমির হতে'', ''আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'', ''আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'', ''এমনি করে ঘুরিব দূরে'', ''আমারে যদি জাগালে আজি নাথ'', ''বিরস দিন বিরল কাজ'' ইত্যাদি। এই তালটির বিভাগ যথাক্রমে ৩/২ মাত্রা বিশিষ্ট এবং উক্ত তালের সম্ আছে কিন্তু খালি নেই।

চতুর্থত – ''ষষ্ঠী'' তাল, এই তালটি কবিগুরুর সৃষ্ট। গানের ও সুরের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গানে তার মাত্রা বিভাগও ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। কোন ক্ষেত্রে ২/৪ মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগ, আবার কোথাও বা ৪/২ মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগ। দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটি সঙ্গীতে এই তালের প্রচলন আছে এবং সেখানে এই তালকে বলা হয় 'পত্তি'। এই তালে রবীন্দ্রনাথ মধ্য ও দ্রুত লয়ে বহুসংখ্যক গান রচনা করেছেন। ২/৪ মাত্রার বিশিষ্ট বিভাগের গানগুলো যেমন– ''আমরা নূতন যৌবনেরই দূত'', ''শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে'', ''রঙ লাগালে বনে বনে'', ''নিদ্রাহারা রাতের এ গান'', ''মধ্যদিনে বিজন বাতায়নে'', ''আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে'' ইত্যাদি।

এছাড়া আরও কয়েকটি গান আছে, যেগুলোর স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে দাদ্‌রা তালে, কিন্তু গানের বাণীর ছন্দের ঝোঁক বিচার করলে দেখা যায় যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গানগুলো ষষ্ঠী তালে গাইলেই মানায় ভালো। এরমধ্যে কিছু কিছু গান রচনাকাল থেকেই ষষ্ঠী তালে গাওয়া হয়ে এসেছে যেমন– ''আহ্বান আসিল মহোৎসবে'', ''বিদায় যখন চাইবে তুমি'', ''ও কি এলো ও কি এলো না'' ইত্যাদি।

আবার ষষ্ঠীর ছন্দকে উল্টে অর্থাৎ ৪/২ ছন্দে রবীন্দ্রনাথ একটি তাল সৃষ্টি করে ব্যবহার করেছেন কেবল একটি মাত্র গানে, গানটি হল– ''হৃদয় আমার প্রকাশ হল''। এই তালের স্বতন্ত্র কোনো নাম দেওয়া হয়নি। ''উল্টো ষষ্ঠী নামেই পরিচিত। আবার একটানা ২ মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগের গান ''হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে''। তবে ষষ্ঠী বলতে ২/৪ ছন্দের তালকেই বোঝা যায়। উক্ত তালে সম্ আছে খালি নেই।

পঞ্চমত– ''রূপকড়া'', এই তালটি ৮ মাত্রা বিশিষ্ট এবং রবীন্দ্র সৃষ্ট তাল। এই তালের বিভাগ

যথাক্রমে ৩/২/৩ মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগ। এই একই ছন্দে (৩/২/৩) দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটি সঙ্গীতে একটি তাল আছে, তালের নাম 'সারতাল'। রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'পূজা' ও 'বিচিত্র', এই দুই পর্যায়ের কয়েকটি গানে রূপকড়ার ব্যবহার দেখতে পাই। এই তালে রচিত প্রায় সব গানগুলোই শান্ত রসাত্মক এবং সেইজন্য এদের লয় ধীর ও সংযত। এই তালের গান যেমন– ''কেন সারাদিন ধীরে ধীরে'', ''ঐ রে তরী দিল খুলে'', ''গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে'', ''এই শরত আলোর কমল বনে,'' ''জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা'' ইত্যাদি। উক্ত তালে সম্ থাকলেও খালি নেই।

ষষ্ঠ – ''নবতাল'', এই তালটি রবীন্দ্রসৃষ্ট এবং নয় মাত্রা বিশিষ্ট। বিভাগগুলি যথাক্রমে ৩/২/২/২ মাত্রা বিশিষ্ট, তবে কয়েকটি গান ও সুরের প্রয়োজনে কবিগুরু ভিন্ন ছন্দেও এই তালটির বিভাগের পরিবর্তন করেছেন। যেমন– ৩/২/২/২ মাত্রা বিশিষ্ট তালে আমরা পাই ''নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা'', ''প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে'' ইত্যাদি। এই গান দু'খানির রচনা, সুরসংযোজনা ও গায়কীর ঢঙের মধ্যে কিছুটা ধ্রুপদের আভাস পাওয়া যায় বলে মৃদঙ্গসংগত সহযোগেই গাওয়া হয়ে থাকে।

উপরোক্ত গান দুটি ছাড়াও ৯ মাত্রায় রবীন্দ্রনাথ আরও তিনটি গান রচনা করেছেন, কিন্তু তাদের ছন্দবিভাগ অন্যরকম। এই গানগুলোর ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ যথাক্রমে ''সংগীতের মুক্তি'' প্রবন্ধে এবং ''গীতপঞ্চাশিকা'' নামক স্বরলিপির বইতে তাঁদের নিজ নিজ মত প্রকাশ করে গিয়েছেন। যেমন–

''ব্যাকুল বকুলের ফুলে'' গানটির ছন্দ রবীন্দ্রনাথের মতে ৩/৬ ছন্দে, অর্থাৎ

| ব্যা কু ল | ব কু লে র ফু লে | – এইরকম।

কিন্তু দিনেন্দ্রনাথ এই গানের স্বরলিপি লিখেছেন ৫/৪ ছন্দে, অর্থাৎ

| ব্যা কু ল ব কু | লে র ফু লে |

এইভাবে ''যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে'' গানটির ছন্দ রবীন্দ্রনাথের মতে ৬/৩ অর্থাৎ

| যে কাঁ দ নে হি য়া | কাঁ দি ছে | – এইভাবে।

কিন্তু দিনেন্দ্রনাথ এই গানের স্বরলিপি লিখেছেন সমপদী ৩/৩/৩ (ত্রিমাত্রিক ছন্দে, অর্থাৎ

| যে কাঁ দ | নে হি য়া | কাঁ দি ছে | – এইরকম।

আরও একটি গান ''দুয়ার মোর পথপাশে'' গানটির ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে। এই গানের তালটিতে ৯ মাত্রা মাঝখানে কোনো আঘাত নেই। প্রথম মাত্রায় (অর্থাৎ সম্-এ) একটি আঘাত তার পরে পুরো ৯ মাত্রার শেষে আবার সম্-এ আঘাত। অর্থাৎ

দু	য়া	র	মো	র	প	থ	পা	শে	স	দা	ই	তা	রে	খু	লে	রা	খি

– এইভাবে।

দিনেন্দ্রনাথও এই ছন্দেই গানটির স্বরলিপি লিখেছেন গীতপঞ্চাশিকায়। দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটি সঙ্গীতে এই তালটি প্রচলিত। তারা একে বলে 'বস্তুতাল'।

উপরোক্ত তিনটি রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল যদিও ৯ মাত্রা বিশিষ্ট তবুও এগুলোকে নবতাল বলা হয় না, কেননা এদের কোনোটিরই ছন্দ ৩/২/২/২ (অর্থাৎ নবতালের) নয়। তবুও 'নবতাল' জাতীয় তাল বলেই এদের গণ্য করা হয় এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এদের ছন্দের ঝোঁক যথাযথ অনুসরণ করে নবতালের ঠেকাই ব্যবহার করা হয় তালযন্ত্রে। এই নবতালে খালির কোন স্থান নেই।

সপ্তম– ''একাদশী'', এই তালটি রবীন্দ্রসৃষ্ট ১১ মাত্রা বিশিষ্ট। তালের বিভাগ যথাক্রমে ৩/২/২/৪ মাত্রা বিশিষ্ট। এই তালেও গানের ভাষা এবং সুরের উপর ভিত্তি করে তালের বিভাগের পরিবর্তন করেছেন। যেমন– ''দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে'' কেবল এই একটি গানের জন্যই রবীন্দ্রনাথ এই (৩/২/২/৪) ছন্দের, এই তালটি প্রবর্তন করেন। গানটির ঢঙ ধ্রুপদ ঘেঁষা বলে মৃদঙ্গ সঙ্গত সহযোগেই গাওয়া হয়। এতেও খালি নেই।

এ-ছাড়া ''কাঁপিছে দেহলতা থর থর'' গানটির জন্য রবীন্দ্রনাথ ১১ মাত্রার-ই একটি তাল ব্যবহার করেছেন যার ছন্দ হল ৩/৪/৪, অর্থাৎ গানের কথাগুলো ছন্দে বসানো হয়েছে–

কাঁ	পি	ছে	দে	হ	ল	তা	থ	র	থ	র	

– এইভাবে।

এটিও নূতন তাল, 'একাদশী জাতীয়' তাল বলে একে গণ্য করা হয় এবং সংগত করবার সময় একাদশীর ঠেকাই একটু ছন্দ বদল করে (অর্থাৎ ১ম, ৪র্থ ও ৮ম মাত্রার উপর ঝোঁক দিয়ে) বাজালেই চলবে।

অষ্টম– ''নবপঞ্চ'', এই তালটিও রবীন্দ্র সৃষ্ট। ইহা ১৮ মাত্রা বিশিষ্ট। এই তালের ছন্দ ২/৪/

৪/৪/৪। এই তালটি সৃষ্টি হয়েছে শুধু মাত্র ''জননী তোমার করুণচরণখানি'' গানটির জন্য। মাত্রা সংখ্যা হিসেবে এই তালটি সর্বাধিক, এবং এতেও খালি নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রসৃষ্ট প্রত্যেকটি তালই বিষমপদী। অর্থাৎ বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান নয় এবং রবীন্দ্রতালে 'সম্' থাকলেও ফাঁক বা খালির কোন স্থান নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে তালের প্রচলিত বিভাগ ও বোলের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা দেখা যায়, মূলতঃ কবিগুরুর সঙ্গীতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মতন তালের স্থান নেই। তালের ছন্দকে সুর বা ভাবের বাহক হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছেন। তা করতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর সঙ্গীতে তাঁরই সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের তাল দেখা, যা রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যতীত অন্যান্য সঙ্গীতে অনুপস্থিত। যেমন– ২/২ ছন্দ, ৪/২ ছন্দ, একটানা ২ মাত্রা বিশিষ্ট ছন্দ, ২/৪ ছন্দ বিশিষ্ট তালকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ষষ্ঠী তাল বলে উল্লেখিত হলেও উপরোক্ত বাকী দুই ছন্দের নাম পাওয়া যায় না।

নবতালের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ছন্দ প্রকরণের গান পাওয়া যায়। ৩/২/২/২ মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগের তালকে নবতাল বলে আখ্যায়িত করলেও ৩/৬ মাত্রা বিশিষ্ট তাল এবং একটানা নয় মাত্রা বিশিষ্ট তালের কোন নামকরণ নেই।

একাদশী তালের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ৩/২/২/৪ মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগের তালকে একাদশী তাল বলে উল্লেখ করলেও ৩/৪/৪ মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগ যুক্ত তালের কোন নাম নেই। এই থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কবিগুরু ভাবপক্ষকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে গিয়ে প্রবর্তিত তাল বা ছন্দের গোঁড়ামী মুক্ত হয়ে সুর বা ভাবপ্রকাশ হেতু উপরোক্ত ছন্দবহুল তাল সৃষ্টি করে এবং তাঁর সঙ্গীতে সেই তাল প্রয়োগের মাধ্যমে বিশেষ বৈচিত্র্য এনেছেন।

গানে বাণীর মত তালকেও রবীন্দ্রনাথ ভাবের প্রকাশ বলে মনে করতেন। তাই তাঁর সৃষ্ট গানগুলোর সুর সংযোজনায় একদিকে তিনি যেমন ইউরোপীয় এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার হতে বিচিত্র সুর সংগ্রহ করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন, সেই প্রকার তাল সম্পর্কেও দেখা যায় তাঁর নবোন্মেষশালিনী সৃজন শক্তির আশ্চর্য প্রকাশ।

তথ্যসূত্র –

১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *সঙ্গীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান*, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৫।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *The Religion of Man,* George Allen and Unwin, London, 1931, পৃঃ ১৪১।

৩. সুভাষ চৌধুরী, *গীতবিতানের জগৎ,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৯, পৃঃ ১২০।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মপরিচয়,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৭, পৃঃ ৯৯।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীত চিন্তা,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ১৮৭।

৬. তদেব, পৃঃ ২১।

৭. তদেব, পৃঃ ৭৮।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পত্রপুট,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৩৮, ১৫ নং কবিতা।

৯. তদেব, ১৫ নং কবিতা।

১০. দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত তত্ত্ব,* ব্রতী, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ১০৪

১১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ*, নবভারত, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃঃ ৫৭।

১২. তদেব, পৃঃ ৬০।

১৩. তদেব, পৃঃ ৬১।

১৪. তদেব, পৃঃ ৬১।

১৫. তদেব, পৃঃ ৬৪।

১৬. দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত তত্ত্ব,* ব্রতী প্রকাশনী কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ১০০-১০১।

১৭. তদেব, পৃঃ ১০১-১০২।

১৮. দিলীপকুমার রায়, *সাঙ্গীতিকী,* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ ৯৭।

এবং

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ*, নবভারত প্রকাশনী কলকাতা, ১৯৫৭ পৃঃ ৬৭-৬৮।

১৯. দিলীপকুমার রায়, *সাঙ্গীতিকী,* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ ১০৫।

এবং

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ,* নবভারত প্রকাশনী কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ ৬৮।

২০. দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত তত্ত্ব,* ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ৩৪।

২১. তদেব, পৃঃ ৩৪।